প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৬ ❖ ৩ - ৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অক্টোবর মাস
পবিত্র জপমালা রাণীর মাস

সংস্কারক আসিসির সাধু ফ্রান্সিস

কুমারী মারীয়া
জপমালায় বন্দিতা রাণী

শিক্ষকমণ্ডলীর চিন্তাজগৎ : শিক্ষাসেবা দেন গভীর ভালবাসায়

ADMISSION GOING ON

সেন্ট মেরীস্ কাথলিক নার্সিং ইনস্টিটিউট

তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (এসএমআরএ সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত)

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ২০২০-২০২১ সেশনে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এণ্ড মিডওয়াইফারী কোর্সে সরকারী নির্ধারিত লিখিত ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রী যারা সেন্ট মেরীস্ কাথলিক নার্সিং ইনস্টিটিউট-এ ভর্তি হতে আগ্রহী তাদেরকে সরকারী পরীক্ষার কৃতকার্যতার ফলাফল সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সহ আগামী ২-১৫ অক্টোবর, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগের ঠিকানা—

সিস্টার মেরী দীপা, এসএমআরএ
০১৭৮৪৮৮৬১৮৬

সিস্টার মেরী চাম্বেলী, এসএমআরএ
০১৭৭৮৩৬৩৯১০

বিজ্ঞ/২৫৮/২০২১

প্রিয় সিস্টার পলিন নাড়ু সিএসসি স্মরণে

জন্ম : ২০/১০/১৯২৮ (আমেরিকা)
মৃত্যু : ৩০/৮/২০২১ (কানাডা)

মার্কিন ব্রতধারিণী সিস্টার পলিন নাড়ু সিএসসি গত ৩০ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কানাডার মন্ট্রিয়াল শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে পিতার রাজ্যে গমন করেন। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ হারালো একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে। সিস্টার পলিন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক কাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তারা ছয় ভাই ও দুই বোন।

কাথলিক স্কুলে ব্যবসা বিষয়ে পড়াশোনা ক'রে পলিন নাড়ু তিন বছর বাবার জুয়েলারী ব্যবসা দেখাশুনা করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি হলিক্রস সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সাত বৎসর বিশেষ পড়াশুনা শেষে সিস্টার পলিন শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ সেবা তথা পরিবার গঠন ও নারী অধিকার বিষয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করেন। বাংলাদেশের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ থাকায় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করেন ও ভাষা শিখেন। পরবর্তীতে ফ্যামিলি কমিশনে তাকে কাজ করার সুযোগ দেয়া হলে সিস্টার পলিন বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করেন। সময়ের পরিক্রমায় ঢাকার মনিপুরীপাড়ায় ফ্যামিলি সার্ভিস সেন্টার চালু করে দম্পতিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

তৎকালীন যাজক বর্তমান বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং ষ্টিফেন-নিলু, রেমন্ড-পুতুল, ক্লেমেন্ট-সুষমা, ফ্রান্সিস-ফিলো, ম্যাথিও-অঞ্জলী, ফাদার অমল ডি' ক্রুশ, ফাদার শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ (বর্তমানে বিশপ) এবং সিস্টার মেরী প্রশান্ত এসএমআরএ'কে নিয়ে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ম্যারেজ এনকাউন্টার মুভমেন্টের পক্ষে এশিয়ান টিম প্রতিনিধিরা এসে বাংলাদেশকে এশিয়া মহাদেশের এক্লেজিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন।

মহান সেবিকা সিস্টার পলিন নাড়ুই হলেন 'বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারেজ এনকাউন্টার মুভমেন্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে কানাডায় ফিরে যান। সেখানে তিনি পথশিশুদের গঠন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট থেকে মণ্ডলীর কাজ করেন। জীবনের প্রতিক্ষণে তিনি বাংলাদেশ ও এদেশে কর্মরত ডাবিওডাবিওএমই (W.W.M.E.) কে সর্ব প্রকার সহযোগীতা ও পরামর্শ দান ক'রে গেছেন। সিস্টার পলিন নাড়ু সর্বদা সত্যের পথে অটল থেকে সুসমাচার প্রচার করেছেন।

সিস্টার পলিন নাড়ুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল ম্যারেজ এনকাউন্টার আন্দোলন কাথলিক বিশপস্ কনফারেন্স অব বাংলাদেশ এর স্বীকৃতি পেয়ে কাথলিক দম্পতিদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এক্লেজিয়া বাংলাদেশ চেপ্টারের পক্ষে আমরা শ্রদ্ধেয়া সিস্টার পলিন নাড়ু'র চিরশান্তি কামনা করি '

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER
AS I HAVE LOVED YOU

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারেজ এনকাউন্টার 'বাংলাদেশ'-এর পক্ষে
রবি-রুবি দরেছ, এক্লেজিয়াল টিম কাপল্, বাংলাদেশ।

হে প্রভু আমার প্রার্থনা শুন।

বিজ্ঞ/২৬৩/২০২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩৬
৩ - ৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৮ -২৪ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

শিক্ষাসেবা ভালবাসা থেকে উৎসারিত হোক

ঐতিহ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে জপমালা রাণী মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করা হয়। গ্রামে-গঞ্জে যেখানে কাথলিকদের সংখ্যা একটু বেশি সেখানে মা মারীয়ার প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা করে রোজারিমালা প্রার্থনা করা হয়। পরিবারগুলোতেও সন্ধ্যা প্রার্থনায় রোজারিমালা বা মা মারীয়ার প্রার্থনারই প্রাধান্য। অনেকে বলে থাকেন আগে খ্রিস্টান পরিবারগুলোতে সন্ধ্যায় রোজারিমালার সুমিষ্ট সুর হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিতো। এখনো কোন কোন এলাকায় সন্ধ্যায় রোজারিমালা প্রার্থনা হয়। তবে তা নগণ্য। এখন রোজারিমালার প্রার্থনার স্থান দখল করে নিয়েছে ক্যাবল টিভির বিভিন্ন সিরিয়ালের উচ্চশব্দের তথাকথিত দর্শকনন্দিত অনুষ্ঠানগুলো বা অনলাইনে সংযুক্ত স্মার্ট ফোনের স্ক্রিন। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই মানুষ ব্যস্ত নিজেকে তাৎক্ষণিক খুশি করতে। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য মানুষ সুখী হচ্ছে না। প্রবীণ অনেকে বলে থাকেন, আগে আমরা সবাই মিলে গল্প, হৈ-হুল্লোর যেমন করতাম তেমনি আবার পরিবারে সবাই মিলে; কখনো কখনো আশে-পাশের কয়েকটি পরিবার মিলে রোজারিমালা করতাম। একসাথে প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে পরস্পরের খোঁজ-খবর নিতাম ও ভাল-মন্দ সহভাগিতা করতাম। ফলে নিজের ও পরস্পরের মধ্যে শান্তি থাকতো। আর এখন দেখা যায় সবকিছু থাকার পরেও শান্তি নেই। তার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হতে পারে, আমরা এখন নিয়মিতভাবে রোজারিমালা প্রার্থনা করি না। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যে পরিবারে প্রার্থনা নেই সে পরিবারে শান্তি নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য অনেক যুবতী মায়েরা প্রার্থনা করেন না। ফলে তারা জানেন না রোজারীমালার শক্তি কতটা। অনেকে হয়তো জানেও না কিভাবে রোজারীমালা প্রার্থনা করতে হয়। তাই পরিবারে শান্তি আনয়ন করতে চাইলে অবশ্যই রোজারীমালা প্রার্থনা করতে হবে। নিজেদের এ প্রার্থনা শিখতে হবে ও সময় বের করে তা নিয়মিতভাবে করতে হবে। নিজেরা নিয়মিত হলে শিশু সন্তানদেরও তা শিক্ষা দিতে হবে। মা মারীয়া নিজেই রোজারীমালা করতে মানুষকে আহ্বান করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নিজে শিশু যিশুকে বিভিন্ন শিক্ষা দিয়ে হয়ে ওঠেছিলেন যিশুর প্রথম শিক্ষয়িত্রী। মা মারীয়া তাঁর নিজের জীবনাদর্শ দিয়ে যিশুকে সর্বাবস্থায় স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা প্রতিপালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মা মারীয়ার মতো প্রত্যেকজন পিতামাতাই কিন্তু সন্তানদের প্রথম শিক্ষক। পরিবারেই একজন শিশু নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধগুলো শিখে। তা শিখতে গিয়ে একজন শিশু তার পিতামাতা, বড় ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনদের কথা শুনেও তাদের অনুসরণ করে। কথা ও জীবনাচরণে সামঞ্জস্য না দেখলে শিশুরা হোঁচট খায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় এবং নীতিহীনতা ও অমানবিকতাকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে শিখে ফেলে। তাই প্রাথমিক শিক্ষালয় পরিবারের সদস্য পিতামাতা ও ভাইবোনদেরকে সচেতনভাবে শিশুদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। সন্তানদের কাছে তাদের পিতামাতা যেমন আদর্শ ও অনুকরণীয় তেমনি একজন শিক্ষকও তার ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে থাকেন।

মানুষের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর ৫ অক্টোবর পালন করা হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। শিক্ষা মানব উন্নয়নের চাবিকাঠি এ মূল্যবোধে বিশ্বাস করেই জাতীয় জীবনে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারও তার বার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা উন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে। শিক্ষা উন্নয়নের কথা বিবেচনা করলে শিক্ষাদান কাজে যারা সরাসরি সম্পৃক্ত তাদের উন্নয়নের কথাও বিবেচনা করা দরকার। শিক্ষাদান করার মতো মহান কাজে যারা জড়িত সেই শিক্ষকেরাও মহান। কেননা এই শিক্ষকেরা শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই দিচ্ছেন না। তারা তাদের জীবন আদর্শ ও বিভিন্ন ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে নিজেদের জীবনকে নিবেদন করছেন শ্রেষ্ঠ সেবাকাজে। তাই শিক্ষকতা শুধু পেশা বা নেশা নয় তা হলো একটি পবিত্র আহ্বান। যাতে সাড়া দিয়ে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মানুষ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত মানুষ করা হলো শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকশিত, ডিগ্রীধারী বা কারিগরি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ নয়। কিন্তু মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন নিরহঙ্কারী মানুষ করাই শিক্ষার লক্ষ্য। আর একাজে কারিগরের ভূমিকা পালন করেন একজন শিক্ষক। শিক্ষকেরা শিক্ষাসেবাতে থাকবেন শিক্ষা বাণিজ্যে নয়। অনেক স্কুলের প্রবেশ পথে বড় করে লেখা থাকে- শিক্ষার জন্য এসো, সেবার জন্য বেরিয়ে যাও। এ মূল্যবোধের চর্চা অব্যাহত থাকলে দেশ উন্নতির দিকে ধাবিত হবে নিশ্চয়। কিন্তু দেশের এক শ্রেণির মানুষ শিক্ষাকে পণ্য করে শিক্ষাবাণিজ্য চালায়। শিক্ষাকে সেবাতে রূপান্তরিত করতে হবে। যিশু শিক্ষাদানের কাজ তাঁর শিষ্যদের মধ্যদিয়ে মণ্ডলীকে দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও কাথলিক চার্চের বিশেষ সুনাম এই শিক্ষাদান সেবাকাজের জন্য। হাজার-হাজার মানুষ গঠিত হয়েছে এ স্কুলগুলোতে শিক্ষা পেয়ে। কাথলিক স্কুল-কলেজগুলোকে আরো বেশি চিন্তা ও পরিকল্পনা করতে হবে কিভাবে পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত মানুষ এই শিক্ষাসেবার আলো পেতে পারে! শিক্ষাদান সেবা হয়ে ওঠে যখন শিক্ষাকার্যক্রমে ভালবাসা জড়িত থাকে। †

যে কেউ শিশুরই মত ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তার মধ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না। (মার্ক ১০:১৫)

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

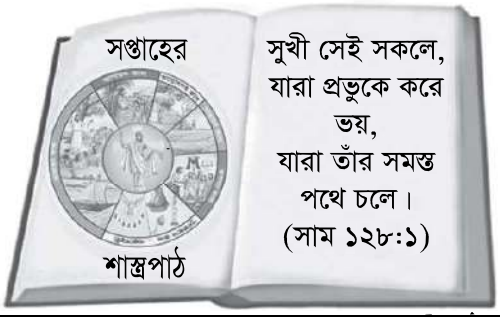

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩ - ৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৩ অক্টোবর, রবিবার
আদি ২: ৮-২৪, সাম ১২৮: ১-৬, হিব্রু ২: ৯-১১, মার্ক ১০: ২-১৬ (অথবা ১০: ২-১২)

৪ অক্টোবর, সোমবার
আসিসির সাধু ফ্রান্সিস- এর স্মরণ দিবস
যোনা ১: ১--- ২: ১, ১১, সাম যোনা ২: ২-৪, ৭, লুক ১০: ২৫-৩৭ গালাতীয় ৬: ১৪-১৮, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-৮, ১১, মথি ১১: ২৫-৩০

৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার
যোনা ৩: ১-১০, সাম ১৩০: ১-৪, ৭খ-৮, লুক ১০: ৩৮-৪২

৬ অক্টোবর, বুধবার
যোনা ৪: ১-১১, সাম ৮৬: ৩-৬, ৯-১০, লুক ১১: ১-৪

৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
জপমালার রাণী মারীয়ার স্মরণ দিবস
শিষ্যচরিত ১: ১২-১৪, সাম লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ১: ২৬-৩৮
চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকা-এর পর্ব দিবস।

৮ অক্টোবর, শুক্রবার
যোয়েল ১: ১৩-১৫; ২: ১-২, সাম ৯: ১-২, ৫, ১৫, ৭-৮, লুক ১১: ১৫-২৬

৯ অক্টোবর, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
যোয়েল ৪: ১২-২১, সাম ৯৭: ১-২, ৫-৬, ১১-১২, লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৫৭ ফাদার চেসারে কাত্তানের পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী মেরিলীন এসএমআরএ (ঢাকা)

৪ অক্টোবর, সোমবার
+ ২০০৯ সিস্টার ডেলফিনা রোজারিও সিআইসি (দিনাজপুর)

৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী আইরিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৯ ফাদার জিওভান্নি আব্বিয়াতি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৯ সিস্টার মারী টুডু এসসি (রাজশাহী)

৬ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৭৭ সিস্টার এম. আইরিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফাদার পৌলিন ডেমার্স সিএসসি
+ ২০২০ ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন সিএসসি (ঢাকা)

৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৩৫ ফাদার পিটার রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফাদার লিও স্যালিভ্যান, সিএসসি (ঢাকা)

৮ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ২০০৬ সিস্টার লরেন্সা গমেজ পিমে (রাজশাহী)

৯ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৮৩ ব্রাদার দামিয়ান ডি ডেল সিএসসি

পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় দৃঢ়ীকরণ

দৃঢ়ীকরণের চিহ্নসমূহ ও অনুষ্ঠান-রীতি

১৩০৪: দৃঢ়ীকরণ, যা দীক্ষাস্নানকে পূর্ণতা দান করে, সেই দীক্ষাস্নানের মতো একবারই মাত্র প্রদত্ত হয়, কারণ দৃঢ়ীকরণও আত্মায় মুদ্রিত করে এক অক্ষয় আধ্যাত্মিক চিহ্ন, "মুদ্রাঙ্কন," যে চিহ্নে যীশু খ্রীষ্ট একজন খ্রিষ্টানকে ঊর্ধ্বলোকের শক্তিতে আচ্ছাদিত ক'রে তাঁর আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত করেছেন, যেন সে তাঁর সাক্ষী হতে পারে।

১৩০৫: এই "মুদ্রাঙ্কন" দীক্ষাস্নানে প্রাপ্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সাধারণ যাজকত্বকে পূর্ণতা দান করে, এবং "দৃঢ়ীকরণপ্রাপ্ত ব্যক্তি খ্রীষ্টে বিশ্বাস প্রকাশ্যে স্বীকার করার ক্ষমতা পায়, এবং তা যেন দায়িত্ববলেই পায়।

(ঘ) সংস্কারটি কে গ্রহণ করতে পারে?

১৩০৬: প্রত্যেক দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি, যারা দৃঢ়ীকরণ সংস্কার পূর্বে গ্রহণ করেনি, তারাই মাত্র এই সংস্কার গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের তা গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু দীক্ষাস্নান, দৃঢ়ীকরণ এবং খ্রীষ্টপ্রসাদ একই ঐক্যে সংগঠিত, সেহেতু "খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ উপযুক্ত সময়ে এই সংস্কারটি গ্রহণ করতে বাধ্য," কারণ দৃঢ়ীকরণ ও খ্রীষ্টপ্রসাদ ব্যতিরেকে দীক্ষাস্নান অবশ্যই সিদ্ধ ও ফলপ্রসূ হলেও খ্রীষ্টীয় জীবনে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৩০৭: বহু শতাব্দী ধরে লাতিন প্রচলিত রীতি "বিচার-বুদ্ধির বয়ঃপ্রাপ্তি" দৃঢ়ীকরণ সংস্কার প্রদানের সময় নির্ধারক হিসেবে উল্লেখ করেছে। কিন্তু মরণাপন্ন অবস্থায় শিশুদের ও দৃঢ়ীকরণ সংস্কার প্রদান করতে হবে, যদিও তাদের বিচার-বুদ্ধির বয়ঃপ্রাপ্তি হয় নি।

১৩০৮: দৃঢ়ীকরণকে কোন কোন সময় "খ্রীষ্টীয় পরিপক্কতার সংস্কার" বলা হলেও, পরিপক্ক বিশ্বাসকে স্বভাবিক বয়ঃবৃদ্ধির সাবালকত্বের সঙ্গে এক করে দেখা উচিত নয়, অথবা আমাদের ভুললেও চলবে না যে, দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ হচ্ছে অযাচিত ও অনর্জিত মনোনয়নের অনুগ্রহ, এবং ফলপ্রসূতার জন্য "সত্যায়িত" করার প্রয়োজন নেই। সাধু টমাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন:

দেহের বয়স আত্মার বয়স স্থির করে না। শিশু বয়সেও মানুষ আত্মিক পরিপক্কতা লাভ করতে পারে: প্রজ্ঞাপুস্তক যেমন বলে, "সম্মানপূর্ণ বার্ধক্য, তাতো দীর্ঘায়ুর নামান্তর নয়, বছরগুলির সংখ্যাও তার মাপকাঠি নয়।" অনেক শিশু, পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করে, সাহসিকতার সঙ্গে খ্রীষ্টের জন্য সংগ্রাম করেছে, এমন কি নিজেদের রক্তপাতও করেছে।

১৩০৯: দৃঢ়ীকরণের প্রস্তুতির লক্ষ্য হতে হবে খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মিলনের দিকে এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে আরও প্রাণবন্ত পরিচয় লাভের দিকে পরিচালিত করা, অর্থাৎ তাঁর কাজ, তাঁর দান এবং তাঁর আমন্ত্রণের দিকে পরিচালিত করা, যাতে তারা খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রৈরিতিক দায়িত্বসমূহ গ্রহণে অধিক সমর্থ হয়। এই উদ্দেশে, দৃঢ়ীকরণের জন্য ধর্মশিক্ষা চেষ্টা করবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই চেতনা জাগাতে যে, তারা যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত, যে-মণ্ডলী বিশ্বজনীন, আবার ধর্মপল্লী-সমাজেও। দৃঢ়ীকরণ প্রার্থীদের প্রস্তুতির জন্য ধর্মপল্লী বিশেষ দায়িত্ব বহন করে॥

কুমারী মারীয়াঃ জপমালায় বন্দিতা রাণী

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

দিনটি ছিল ২২ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী বন্ধ থাকার দরুণ আমরা তখন নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। শরতের পড়ন্ত বিকেল। মেঘমুক্ত আকাশ। তখনো সূর্যটা ডুবেনি। পশ্চিম আকাশে বড় লাল সূর্যটা তখন ডুবু ডুবু। চারিদিকে গোধূলির হাল্কা উজ্জ্বল আলো। আমার মা ও আমি আমাদের ধর্মপল্লীর গির্জা থেকে বাড়ি ফেরার পথে। কোন একটি প্রয়োজনে গির্জায় গিয়েছিলাম আমাদের পাল-পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলতে। মা আর আমি দু'জনে কথা বলতে বলতে মেঠোপথে হেঁটে বাড়ির দিকে আসছিলাম। গির্জা থেকে আমাদের কদমতলী গ্রাম পর্যন্ত সম্পূর্ণই কাঁচারাস্তা।

হাঁটতে হাঁটতে মা আর আমি আমাদের বাড়ির অনেকটা কাছেই চলে এসেছি। অর্থাৎ আমরা তখন পথিমধ্যে এমন একটি অবস্থানে যেখানে আমাদের পিছনে (ওয়াইএমসি এর মোড়) কয়েকটি মুসলিম বাড়ি আর আমাদের সামনে খ্রিস্টানপাড়া (বাউল বাড়ি)। পথ চলতে চলতে একসময় আমি মাকে পেছনে রেখে সামনে সামনে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালাম! দেখলাম, আমার ঠিক সামনেই উপরে আকাশটা কেমন যেন ঝলমলিয়ে আলোকিত হয়ে গেল। অনেকটা লালচে ও ঘন সোনালী আলো দ্রুত বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ আমার সামনে আকাশে সেই আলোর মধ্যে ভেসে উঠল- বিশালদেহী কুমারী মারীয়া। তিনি তাকিয়ে আছেন ঠিক আমার দিকে। আমিও অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম! মা মারীয়াকে চিনতে আমার এতটুকুও ভুল হল না! কুমারী মারীয়ার পড়নে ছিল লাল গাউন ও গায়ে জড়ানো ঘন সবুজ শাল।

এবার দেখলাম মা মারীয়ার কোলে মুচকি হাসিরত শিশু যিশু। শিশু যিশুর গায়ে ধবধবে সাদা কাপড় জড়ানো। মা মারীয়া পরম মমতায় দুই হাত দিয়ে বাম পাশের কোলে শিশু যিশুকে আগলে রেখেছেন। আর শিশু যিশু দুই হাতে আকরে ধরে ঝুলিয়ে রেখেছেন একটি বিশালাকৃতির জপমালা। শিশু যিশুর হাতের জপমালাটির রং ছিল অনেকটা চকোলেট রঙের। এরপর আমি দেখলাম মা মারীয়ার ঠিক বাম পাশে এসে দাঁড়ালেন আমার প্রিয় সাধ্বী, কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা। তাঁর হাতেও জপমালা। তিনিও শিশু যিশুর মত জপমালাটি ঝুলিয়ে রেখেছেন। দেখলাম সাধ্বী মাদার তেরেজার হাতের জপমালাটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রঙের।

আমি অপলক তাকিয়েই আছি আকাশে তাঁদের দিকে। এবার মা মারীয়ার ডান পাশে এসে দাঁড়ালেন আমার প্রিয় সাধু, পাদুয়ার সাধু আন্তনী। সাধু আন্তনীর হাতে ধরে থাকা জপমালাটির রঙ ছিল সাদা ধবধবে। তাঁরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে জপমালা ঝুলিয়ে রেখেছেন। তাঁরা কেউ-ই মূর্তিরূপে ছিলেন না, ছিলেন জীবন্ত। হাঠৎ আমি চিৎকার করে

কেঁদে উঠলাম। জানিনা কেন! এবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে আমার মাকে জোরে ডেকে বললাম- মা, ঐ দেখো মা মারীয়া...! আমার কথা শুনে মা দ্রুত আমার পাশে এলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে আবারো আমার অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললাম- মা, ঐ দেখো, আকাশে জীবন্ত মা-মারীয়া, মা মারীয়ার কোলে শিশু যিশু, মা মারীয়ার বাম পাশে মাদার তেরেজা আর ডান পাশে সাধু আন্তনী। দেখো, তাঁরা সবাই রোজারিমালা ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে। এতো বলার পরেও আমার মা কিছুই দেখতে পেল না। অথচ আমি সবই দেখলাম...।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। কানে ভেসে এলো গির্জার ঘন্টাধ্বনি। তখন ঘড়িতে সময় ভোর ৫:২৫ মিনিট। ঘুম ভাঙার পরেও অনুভব করলাম আমার দু'চোখ তখনো অশ্রুসিক্ত। সেই রাতে আমি মা-বাবার ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলাম। জেগে ওঠার পর সাথে সাথেই বাস্তবে আমার মাকে স্বপ্নের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। মা সমস্ত শুনে বললেন, বাবা, কুমারী মারীয়া হয়তো তোমার কাছে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করছেন। বাবা, তুমি প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করো-পাপী মানুষের মুক্তির জন্য, বিপথগামী মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য এবং জগৎ থেকে মহামারি করোনা ভাইরাস দূর হওয়ার জন্য...। আমার মা আরো বলতে লাগলেন, দেখো বাবা, তোমরা আমার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছ ঠিকই কিন্তু তোমাদের প্রতিদিন লালন-পালন করছেন মা মারীয়া।

আমি তো বাড়িতে থেকে তোমাদের জন্য কেবল প্রার্থনাটুকুই করি আর মা মারীয়া-ই সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকেন...। বাবা, হতেও তো পারে আর দশজন সন্তানের মত তোমাকেও আজ মা মারীয়ার প্রয়োজন! আমার মায়ের মুখে এমনতর কথাগুলো শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। হৃদয়ে কেমন যেন শান্তি অনুভব করলাম। এরপর আমি প্রস্তুত হয়ে ভোরের দৈনিক খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের ধর্মপল্লীর গির্জার দিকে পা বাড়ালাম। দিনটি ছিল শনিবার। মাতামণ্ডলীতে কুমারী মারীয়ার উদ্দেশে নিবেদিত বিশেষ খ্রিস্টযাগের দিন। খ্রিস্টযাগের আরম্ভে পাল-পুরোহিতের ভূমিকা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম! কেননা সেদিন ছিল বিশ্ব-রাণী মারীয়ার পর্বদিন। ভাবতে লাগলাম, এমন দিনে মা মারীয়াকে স্বপ্ন দেখা, এর মানে কি? মানে খুঁজতে খুঁজতে খ্রিস্টযাগের পর আমি আমার ছেলেবেলার অভ্যাস মত আমাদের গির্জার অভ্যন্তরে মা মারীয়ার মূর্তির সামনে গিয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম- প্রণাম গো মা স্বর্গের রাণী...। তুমি আজ ভোরে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছ। তাতে আমি অনেক খুশি হয়েছি। তবে একটু কষ্টও অনুভব করছি। কারণ তুমি আমাকে কোন কথা বলোনি। আচ্ছা, আমার মায়ের কথাগুলোই কি তবে তোমার না বলা কথা...? গির্জা থেকে বাড়িতে ফিরে এসে আমার ছোট ভাই এবং প্রতিবেশি এক ঠাকুরমা ও কাকাকে বললাম ভোর রাতে দেখা স্বপ্নের কথা। ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরে এসে একসময় আমাদের পরিচালক এবং আমার আধ্যাত্মিক পরিচালকের সাথে স্বপ্নটা সহভাগিতা করলে পর, তারা সকলেই সেই একই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করল- প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করো; হয়তো এই সময়ে তোমাকেও মা মারীয়ার প্রয়োজন...!

সংস্কারক আসিসির সাধু ফ্রান্সিস

পিটার ডি পালমা

ফ্রান্সিস মনে প্রাণে একজন প্রার্থনাশীল, আধ্যাত্মিক ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন তা নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য। নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে গরীবের তরে সমর্পণ করেন। সাধু ফ্রান্সিস ছিলেন সকলের গ্রহণীয় ও হাসি খুশি প্রকৃতির মানুষ। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়, চেনা-জানা ও জনপ্রিয়। ইতালির মহাকবি দান্তে ফ্রান্সিসের উদ্দেশে বলেন,"পৃথিবীর এক নতুন সূর্য উদিত হল"।

পরিচয়

ইতালির আসিসি নগরে ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন সাধু ফ্রান্সিস। তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ী পিতা পিয়েতরো দি বের্ণারডোনে ও মাতা পিকার বড় ছেলে। তাকে যোহন নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হলেও ফ্রান্সিসকো নামে ডাকা হতো। তার বাড়ীর নিকটবর্তী ধর্মপল্লীর স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাজীবন লাভ করেন। সাধু ফ্রান্সিস তার কৈশোর জীবনে বন্ধুদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। ফ্রান্সিসের নম্র-ভদ্র আচরণের জন্য তারা তাকে "যুব ফুল" বলে ডাকতো। তিনি ও তার দলের সদস্যরা সর্বদা জাকজমক পোশাক পড়তেন। তিনি অনেক আমোদপ্রমোদের জীবন-যাপন করলেও ব্যবসায়ীক কাজে বাবাকেও সাহায্য করতেন।

দেশপ্রেমী ফ্রান্সিস

সম্রাট ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে প্রদেশের ছোট-ছোট বিভাগ গুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করে সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করলে ফ্রান্সিস শহরের স্বার্থে যুদ্ধে যোগ দেন। দুঃখের বিষয় তিনি কিছু যুবকদের সাথে (১২০২-১২০৩) কারাগারে বন্দি হন। কারাগারে থাকলেও তার মধ্যে কোন কষ্টের ছাপ পড়েনি। তিনি সর্বদা আনন্দে সময় কাটাতেন। তাই তাঁর সঙ্গীরা তাকে বলতেন, এখন এসব করার সময় না। আমাদের এখন লক্ষ্যই হলো কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু সাধু ফ্রান্সিস তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ভয় পাবার কিছু নেই, ভাল দিন একদিন আসবেই।

সাধু ফ্রান্সিসের মন পরিবর্তন

ফ্রান্সিস সুস্থ হবার পর একদিন হাঁটাহাঁটি করছিলেন। এসময় তিনি তার জীবনে প্রথম বারের মত মনে করলেন, তিনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। এ সময়টি ভালভাবে ব্যবহার করে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করতে পারেন। তখন তার খুব ইচ্ছে হলো সামরিক বাহিনীর উচ্চস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার, তাই তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য রওনা হলেন। পথিমধ্যে কোন এক রাতে তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, "ফ্রান্সিস তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি সেনা প্রধান হতে চাও? কেন তুমি তোমার প্রভুকে অস্বীকার করছ?" ফ্রান্সিস জানেন এটি ঈশ্বরের কণ্ঠ কিন্তু তার মানে কি তা তিনি বুঝতে না পেরে আবার আসিসিতে ফিরে গেলেন। পুরনো সঙ্গীদের সাথে আর আগের মত মিশতে পারলেন না। তিনি জীবন পরিবর্তন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

ফ্রান্সিসের গির্জা সংস্কার

ফ্রান্সিস সাধু দামিয়ানোর চ্যাপেলে প্রার্থনা করতে ভালবাসেন। তিনি একদিন ক্রুশবিদ্ধ

যিশুর দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছিলেন, "প্রভু আমাকে আলোকিত কর। আমাকে বলে দাও, আমাকে কি করতে হবে"। তখন তিনি সেই ক্রুশ থেকে শুনতে পেলেন, "আমার গৃহটি ভেঙ্গে পড়ছে। যাও, এটাকে মেরামত কর"। তাই ফ্রান্সিস কাপড়ের রোল ও ঘোড়াটি বিক্রি করে দিলেন ও চ্যাপেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরোহিতকে দিলেন। পুরোহিত তার বাবার ভয়ে নিতে না চাইলে তিনি টাকাগুলো জানালায় রেখে চলে আসেন। তার টাকা না থাকায় চ্যাপেল সংস্কারের জন্য তিনি রাস্তা-ঘাটে গান গেয়ে গেয়ে টাকা সংগ্রহ করেন। গানটি হলো,

সাধু দামিয়ানো-গির্জা সংস্কারে
কে পাথর দান করবে?
যিনি করবেন একটি পাথর দান
তিনি পাবেন একটি প্রতিদান,
যিনি করবেন দু'টি পাথর দান
তিনি পাবেন দু'টি প্রতিদান,
যিনি করবেন তিনটি পাথর দান
তিনি পাবেন তিনটি প্রতিদান।

তিনি মানুষের কাছ থেকে নিজে পাথর বহন করে আনেন। এরপর তিনি চ্যাপেলটির পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সাধু দামিয়ানোর চ্যাপেলটি সংস্কারের পর আসিসি শহরের প্রবেশ দ্বারে সাধু পিতরের গির্জাটি সংস্কার করেন। আসিসি শহরের কাছাকাছি একটি জঙ্গলে "স্বর্গদূতদের পবিত্র মারীয়া" নামে উৎসর্গীকৃত ছোট একটি গির্জা ছিল। ফ্রান্সিস এ গির্জাটিও সংস্কার করেন।

মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন সংস্কার

সাধু ফ্রান্সিস ও তাঁর দলের সদস্যরা শুধুমাত্র চ্যাপেল ও বেদী সংস্কার করেননি, তার সাথে সাথে তারা মানুষের আত্মার সংস্কারও করেছেন। রোম থেকে ডিকন হয়ে ফিরে যখন নতুন অনুপ্রেরণায় তার বাণী প্রচার কাজ শুরু করেন, তাদের ব্যক্তিত্ব, প্রচার কাজ ও জীবনাদর্শ দেখে অনেক মানুষ মন পরিবর্তন করতে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি তার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা থেকেই ফ্রান্সিস সমস্ত সৃষ্টিকে ভালবাসার অনুপ্রেরণা পান। তার কাছে সমস্ত সৃষ্টি হলো ভাই-বোনের মত।

দরিদ্রতাকে আলিঙ্গন

সাধু ফ্রান্সিস গরীব দুঃখীদের উদার হস্তে সাহায্য (বিশেষ করে অর্থ দিয়ে) করতেন। তিনি মনে করতেন তিনি যে পরিমাণ মানুষকে সাহায্য করবেন ঈশ্বর তাকে তার শতগুণ ফেরত দিবেন। কোন একদিন সাধু ফ্রান্সিস দোকানে অনেক ব্যস্ত ছিলেন। একজন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি অনেক বিরক্ত হন এবং পরে তার ভুল বুঝতে পেরে সেই ভিক্ষুকের কাছে ক্ষমা চান ও তাকে ভিক্ষা দেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন আর কোন দিন তিনি কোন ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন না। সাধু ফ্রান্সিস এটুকু বুঝতে পারলেন যে, তাকে যিশুর মত দীন-দরিদ্র হতে হবে ও যিশুর সেবা করতে হবে। তাই তিনি নিয়মিত ভাবে বাইবেল পাঠ ও তার উপর ধ্যান করতে শুরু করেন। পুরনো জীবনে যেন আর যেতে না হয় তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে শক্তি প্রার্থনা করেন। গরীব-দুঃখীদের সাহায্য ও ধর্মপল্লীতে উপাসনায় ব্যবহৃত জিনিস কিনতে গিয়ে সব টাকা পয়সা খরচ করে ফেলেন। তাই তার অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য তার দামী জুতা ও কাপড়ও বিক্রি করে দেন। তার প্রত্যাশা তিনি মনে প্রাণে একজন ভিক্ষুক হবেন। সাধু ফ্রান্সিস মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন। যা পেতেন তা থেকে কিছু অংশ তিনি গরীবদের দান করতেন এবং কিছু দামিয়ানো চ্যাপেলের সংস্কার কাজে ব্যবহার করতেন। তারা তাকে যা খেতে দিত তা বাড়ীর মত সুস্বাদু না হলেও তিনি আনন্দ সহকারে তাই খেতেন। রোমে তীর্থ করে দরিদ্রতার জীবনে শিক্ষানবিস হিসেবে প্রবেশ করার প্রয়াসে তিনি সাধু পিতরের কবরে গিয়ে টাকার থলি খালি করেন। তিনি নিজের কাপড় ভিক্ষুককে দিয়ে ও ভিক্ষুকের কাপড় নিজে পরে তীর্থস্থানে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করেন। যা পান তা অন্য ভিক্ষুকদের দিয়ে দেন ও নিজের কাপড় পরে আবার আসিসিতে ফিরে আসেন। একবার ফ্রান্সিস যখন কাপড়ের রোল ও ঘোড়াটি বিক্রি করেছিলেন তার বাবা শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ জানালে ফ্রান্সিস ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "ঈশ্বর ব্যতিত আমার কোন গুরু নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমি হাজির হতে বাধ্য নই"। ফলে ফ্রান্সিসের বাবা

বিশপের কাছে অভিযোগ জানালেন। বিশপ ফ্রান্সিসকে বুঝানোর পর তিনি সব কিছু এমন কি পরনের কাপড়টিও খুলে ফেলে তার বাবার পায়ের কাছে রেখে দারিদ্রতাকে আলিঙ্গন করলেন।

গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন ফ্রান্সিস

সাধু ফ্রাসিসের কুষ্ঠরোগীদের প্রতি বিরক্তিভাব ছিল। যখন তিনি কুষ্ঠরোগী দেখতেন অন্য পথ দিয়ে চলে যেতেন। একদিন ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের পথ ধরে বেড়াচ্ছিলেন। সে সময় তিনি এক কুষ্ঠরোগীকে দেখতে পান। তিনি তাকে সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস নিজেকে সংযত করে কুষ্ঠরোগীকে কিছু টাকা দেন ও তার হাতের আঙুলে কুষ্ঠরোগের পচনের মধ্যে চুম্বন করেন। তিনি অনুভব করলেন যেন স্বয়ং খ্রিস্টকেই চুম্বন করছেন। এর পরের দিন তিনি হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভ্রাতৃসংঘ গঠন

"স্বর্গদূতদের পবিত্র মারীয়া" নামক গির্জাটি সংস্কার করার পর ফ্রান্সিস মাঝে মাঝে এখানে প্রার্থনা করতে আসতেন। এ জায়গাটি খুব নির্জন বলে তিনি এখানে বাস করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। তাই কাদা-মাটি ও লতাপাতা দিয়ে একটি কুটির তৈরি করেন। মাত্র তিন জন শিষ্যকে নিয়ে তিনি একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করেন ও তার শিষ্যদের নিয়ে এ কুটিরে বসবাস শুরু করেন। ফ্রান্সিসের শিষ্যের সংখ্যা যখন ১২ জন হলো তার সম্প্রদায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদের জন্য পুণ্যপিতা পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট'র কাছে রোমে যান। তাদের পোশাকগুলো ভিক্ষুকের পোশাকের মত ছিল যা দেখতে একই রকম। পোপ ফ্রান্সিসকে দেখে চিনতে পারলেন যাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। পোপ ১২০৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিকে স্বীকৃতি দেন এবং ফ্রান্সিসকে এই ধর্মসংঘের প্রথম সংঘপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। তাকে ডিকন বানানো হলে তিনি নম্রতার সাথে সেই সময় পুরোহিত মর্যাদা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ধর্মব্রতীর সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজার। এ সংঘটি ক্যাপুসিন বা ফ্রান্সিসকান নামে পরিচিত।

ভগিনীসংঘ (দরিদ্র ক্লারা সংঘ) গঠন

সংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য পোপের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর ফ্রান্সিসের বাণীপ্রচার আরো বেড়ে যায়। ফ্রান্সিস একদিন আসিসি শহরের ক্যাথিড্রালে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তার ভাষা এত সহজ ও বোধগম্য ছিলো যে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ক্লারা নামে এক যুবতী ছিল। বাল্যকাল থেকেই ক্লারা সাধু-সাধ্বীদের জীবনী পড়তে ভালবাসতেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে এক ধনী যুবক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার বাবা-মার সম্মতি থাকলেও ক্লারা অসম্মতি জানান। কারণ তার কৌমার্য ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। ফ্রান্সিসের উপদেশ শুনে ক্লারা তার অধ্যাত্মসাধনা চর্চার অনুপ্রেরণা পান। ভ্রাতৃসংঘে নারীদের থাকার অনুমতি না থাকায় ফ্রান্সিস নিকটবর্তী সাধু পৌলের নামে উৎসর্গিত বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসীদের মঠে ক্লারাকে রাখেন যদিও তার বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের কোন ইচ্ছা ছিলনা। তার ছোট বোন আগ্নেস ও বেয়াত্রিসও এ সংঘে যোগ দেয়। দিনে দিনে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে ফ্রান্সিস বুঝতে পারলেন, সন্ন্যাসিনী সংঘের জন্য আলাদা নিয়মাবলী প্রয়োজন। ফ্রান্সিসের নির্দেশে ক্লারা সন্ন্যাসিনী সংঘের নিয়মাবলী রচনা করেন। পোপের অনুমতিক্রমে এ সংঘের নাম দেওয়া হয় "ফ্রান্সিসকান সিস্টার সংঘ"।

ফ্রান্সিসের তৃতীয় সংঘ গঠন

ফ্রান্সিস একবার পাখিদের কাছে বাণীপ্রচার করার পর আলভিয়ানো বাজারে পৌঁছে শাস্ত্র থেকে প্রার্থনাসঙ্গীত গাইতে লাগলেন। তাতে বহুলোক জড়ো হলো তার উপদেশ শুনার জন্য। চারিদিক নীরব হলেও পাখিগুলো কল-কাকলি ধ্বনিতে মাতিয়ে তুলল। শ্রোতাদের শুনতে সমস্যা হচ্ছে বলে ফ্রান্সিস উড়ন্ত পাখিদের লক্ষ্য করে বললেন, "ভাইসব, আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ দাও"। তখনই পাখিগুলো চুপ হয়ে গেল। তা দেখে তখন অনেকেই তার শিষ্য হতে চাইলো। ফ্রান্সিস তাদের বাধা দিয়ে বললেন, "এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। সংসার পরিত্যাগ না করে কিভাবে মুক্তি পেতে পার, আমি সেই উপায় দেখাব"। প্রভুর নির্দেশ পাবার জন্য তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন এবং তিনি এর আলোর সন্ধানও পেয়ে গেলেন। সংসারীদের নিয়ে তিনি গঠন করলেন তার তৃতীয় সংঘ। এর নাম দেন "সংসারীদের সংঘ"।

ফ্রান্সিসের শেষ জীবন

জীবনের শেষ ২ বছর ফ্রান্সিসকে অনেক শারীরিকভাবে কষ্ট-ভোগ করতে হয়েছে। যতই দিন যায় ততই তার স্বাস্থ্য অবনতির দিকে ধাবিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে ফ্রান্সিস তার অনুসারীদের শেষ উপদেশ দিয়ে যান, তারা যেন একে অপরকে ভালবাসে, দরিদ্রতার ব্রত যেন বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে, কর্তৃপক্ষের যেন বাধ্য থাকে, পুণ্যপিতা পোপের প্রতি যেন আনুগত্য প্রকাশ ও কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতা যেন কামনা করে।

ফ্রান্সিস একাকী নিরব ধ্যান ও প্রার্থনায় সময় কাঁটাতেন। তিনি যিশুর ক্রুশীয় পঞ্চক্ষত ধারণ করে প্রভুর জন্য যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবন-যাপন করে নিজেকে ধন্য মনে করেন। ফ্রান্সিস ছিলেন অনেক বিচক্ষণ বাণীপ্রচারক। তাই তিনি মাঝে মাঝে প্রচার কাজে বের হয়ে কোন উপদেশ না দিয়েই চলে আসতেন। কারণ তিনি মনে করেন, তাদের আত্ম-সংযম, ক্ষমা, প্রার্থনা ও পবিত্রতার জীবনাদর্শ নীরবে অনেক প্রচার কাজ করে থাকে। অবশেষে সাধু ফ্রান্সিস ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে ৩ অক্টোবর ৪৫ বছর বয়সে মারা যান।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১। মন্ডল, সন্তোষ (অনুবাদক): *আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ক্ষুদ্র পুষ্প*, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০০৬।

২। New Catholic Encyclopedia, v.5, 2nd ed., s.v., "Francis of Assisi" By R. Armstrong.

৩। মূর্মূ, জেরেমিয়া বিনয়: আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ও তাঁর অবদান, বাড়ী কাজ, ১ম শিক্ষাবর্ষ, ২০১২, পৃষ্ঠা ৭৬-৮০।

৪। রোজারিও, আলবার্ট টমাস: *সাধু-সাধ্বীদের জীবনীকথা*, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশন, ঢাকা, ২০১৫।

৫। আগষ্টিন, জি. : *খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর ইতিহাস*, সাধু যোসেফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট অফ্ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, ২০০৫।

১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত গাব্রিয়েল টমাস পেরেরা

জন্ম : ২০ অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৯ অক্টোবর, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

চড়াখোলা (ফড়িং বাড়ি)

তুমিলিয়া মিশন।

'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তবু আমারে দেব না ভুলিতে'

প্রাণপ্রিয় বাবা,

তোমার স্বর্গধামে যাত্রার আজ পনেরটি বছর পূর্ণ হলো। আমরা ভুলিনি তোমার মুখচ্ছবি-জীবনাচরণ, পারা যায়ও না ভুলতে। তুমিই তো আমাদের পৃথিবীর আলোর পথের দিশারী। যেথায় ছিল ঈশ্বরের অসীম ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা যেন আমরা পূর্ণ করতে পারি। এই প্রার্থনায়

তোমার সন্তানেরা ও
স্ত্রী: কর্পুলা পেরেরা

বিজ্ঞ/২৬০/২১

শিক্ষকমণ্ডলীর চিন্তাজগৎ: শিক্ষাসেবা দেন গভীর ভালবাসায়

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

প্রণতি জানাই সকল শিক্ষক মণ্ডলীকে। পিতৃতুল্য মাতৃতুল্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের হৃদয়ছোঁয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করা সত্যিই বিহিত ন্যায্য সমীচীন ও কল্যাণকর। প্রতিনিয়ত অভিনব প্রচেষ্টায়, অনুপম প্রজ্ঞায় শিক্ষার্থীদের মনোমন্দিরে পূত পবিত্র দীপ শিখা জ্বেলে দেন। শিক্ষক তাঁর জ্ঞান, মেধা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জাতিকে বিকশিত করে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেন। সকল শিক্ষার্থী যেন বলে গুরুজী।

শিক্ষা ও শিক্ষকতা : যা ভেবে দেখা জরুরী

শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষক। শিক্ষক শব্দ, যা বর্ণনানুক্রমিক বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়:
শিক্ষক : শি = শিষ্টাচার,
ক্ষ = ক্ষমাশীল,
ক = কর্তব্যপরায়ণ।
Teacher :T = Truthful সত্যবাদী
E =Educated শিক্ষিত
A = Active সক্রিয়
C = Character চরিত্রবান
H = Honest সৎ
E = Energetic উদ্যোগী
R = Responsible দায়িত্ববান

কাজী রায়হান স্যার, কারিতাস ঢাকা অফিসের প্রশিক্ষক, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা ট্রেনিং ক্লাসে বলেছিলেন: একজন শিক্ষক শিক্ষিকার থাকে প্রখর কল্পনাশক্তি ও যথাযোগ্য সৃজনশীলতাসহ একটি পরিচ্ছন্ন মন মস্তিস্ক, সমালোচনামূলক চোখ, উপলব্ধি করতে সক্ষম চোখ, গ্রহণে তৎপর কান, ভাববিনিময়ে হাস্য, সমস্যা সমাধানে পারদর্শী স্কন্ধ, সহযোগিতার একটি হাত ও পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম নিপুণ হস্ত।

শিক্ষাঙ্গন হবে সুশিক্ষিত জ্ঞানবান দক্ষ মানুষ গড়ার কর্মশালা। চৌধুরীর কথা প্রণিধানযোগ্য : শিক্ষকের স্বার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতুহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর চেয়ে বেশী আর কিছু করতে পারেন না"।

নৈতিক মূল্যবোধে জীবন গঠনে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা

শিক্ষার মাধমে শুধুমাত্র মেধার বিকাশ নয়, বরং নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো: শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন ও উপযুক্ত নাগরিকরূপে তাদের গড়ে তোলা। বর্তমান বাস্তবতায় দেখি সমাজে ৭টি সামাজিক পাপ বিরাজমান। নীতি বিহীন রাজনীতি, সততা বিহীন সম্পদ, নৈতিকতা বিহীন বাণিজ্য, চরিত্র বিহীন শিক্ষা। বিবেক বিহীন আনন্দ। মানবতা বিহীন বিজ্ঞান। নিষ্ঠা বিহীন প্রার্থনা।

প্রযুক্তির যুগে ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। শিশুদের মধ্যে নৈতিকতার সংকট গভীরতর হচ্ছে। ভাল মন্দের দ্বন্দ্বে আজকাল ছাত্র-ছাত্রী প্রায়ই মন্দতাকেই বেছে নেয়। আত্মার চেয়ে দেহের প্রয়োজনই এখন বড় বেশী অনুভূত হচ্ছে। সাইবার কাপের দাপটে, আকাশ সংস্কৃতির কুপ্রভাবে ধর্মবিশ্বাস আজ হিমশিম খাচ্ছে।

শিশুদের মধ্যে বিকৃত যৌন আচরণ; বিভিন্ন অনৈতিক ধারায় একত্রে বসবাস; স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে নগ্ন ছবি প্রদর্শন শিশুদের উচ্ছৃঙ্খল করছে। তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহে ভেসে গিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন খারাপ কাজের প্রতি (পর্নো ছবি) আসক্ত হয়ে পড়ছে যা কাম্য নয়। শিশুরা এখন বিবেকহীন হয়ে পড়ছে। শিশুর নৈতিক মূল্যবোধ প্রকাশিত ও বিকশিত হয় অন্যদের সাহচর্যে। এসব কারণে শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরকার। পাঠ্যপুস্তকে নীতিকথা লিখিত থাকে।

মনের মধ্যে প্রশ্ন উকি দেয়! মনুষ্যত্বকে বিকশিত করতে, মূল্যবোধ জাগ্রত করতে শিক্ষক শিক্ষিকাগণ কি সফলকাম হন? শিক্ষার্থীর জীবন আচরণে নৈতিক মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও গভীরতা পায়? "আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি নিখিল বন নন্দনে"- এই নিখিল বন নন্দনে আজকে যে শিশু কুঁড়ি, আগামীতে সেই হবে প্রস্ফুটিত কুসুম যা সৌন্দর্যে সুশোভিত ও সৌরভে সুরভিত করবে দিক-দিগন্তকে। আজকের শিশুই আগামীর ভবিষ্যৎ, আগামীতে দেশের কর্ণধার। সুতরাং সেই শিশুকে সুন্দর সুচারুরূপে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। Important Moral Values Students Should Learn in School. শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধগুলো শিক্ষার্থীরা শিখবে যেমন : দানশীলতা / উদারতা Kindness, সততা Honesty, কর্তব্যনিষ্ঠা/ পরিশ্রম Hard Work, অপরকে সন্মান করা Respect for Others, সহযোগিতা Cooperation, পরদুঃখকাতরতা / সহানুভূতি Compassion, ক্ষমা Forgiveness ইত্যাদি।

নৈতিক দাবী: শিক্ষক মণ্ডলী গভীর ভালবাসায় শিক্ষা প্রদান করবেন

শিক্ষাঙ্গন অর্থকেন্দ্রিক না হয়ে যেন হয় জ্ঞানকেন্দ্রিক। শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ তৈরী করবেন- শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী নয়। শিক্ষকবৃন্দের পেশাগত নৈতিকতা রক্ষা করবেন। শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত, জ্ঞান-অন্বেষাকে প্রণোদিত, চেতনাকে সুসংবদ্ধ করবেন। শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনার বিকাশ, ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝতে, কল্যাণবোধ, দায়িত্বাবোধ জাগ্রত এবং হৃদয়মন আলোকিত করবেন। দার্শনিক বার্ট্রেন রাসেল শিক্ষকের কাজ সম্পর্কে বলেছেন যে, "The function of a teacher is not to teach, to guide how to learn."

শিক্ষক শুধু সিলেবাসভিত্তিক নীরস তত্ত্ব বা তথ্য শিক্ষা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন না। শিক্ষকমণ্ডলী দায়িত্বহীনতার ও অস্বচ্ছতার প্রমাণ দিবেন না। পাঠ্যপুস্তক ঘেটে প্রশ্ন করবেন। গাইড থেকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবেন। শিক্ষকবৃন্দ গতানুগতিকভাবে দায়সারা দায়িত্ব পালন করবেন না। শিক্ষার্থীদের ব্রেইন স্টরম (brain storm) করার দায়িত্ব পালন করবেন। একজন শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় **সদাচরণ (Good conduct)**, **উজ্জ্বল ভাব-মূর্তি (Bright image)**, যাপিত জীবনে আদর্শ ও নীতিতে অবিচল থাকা। শিক্ষক শিক্ষিকার হৃদয়ে মনে অনুরণিত হোক: **আমি প্রয়োগ করবঃ** নৈতিক বিচার-বুদ্ধি, **অর্জন করবঃ** প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নৈতিকতা, **হবঃ** বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। **আমি ধারণ করবঃ** একটি সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষকমণ্ডলীর **অনুধ্যানমূলক প্রশ্নঃ** আমি কি প্রায়ই বিদ্যালয়ে দেরীতে আসি? আমি কি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করি? শিক্ষক শিক্ষিকাগণ কি তাদের বিবেক সঠিকভাবে গঠন করতে পারছেন?

উপসংহার

কি বার্তা দেয় শিক্ষক দিবস। শিক্ষকের আদর্শ কি? সমাজে তাঁর অবস্থান কোথায়? জ্ঞান ভিত্তিক সুখী সমাজ নির্মানই শিক্ষকতা জীবনের নির্যাস। শিক্ষক না থাকলে পৃথিবীতে এত জ্ঞানী গুণী মানুষ হতো না। সভ্যতার বিকাশে ও সৃষ্টিশীলতায় জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। আর জ্ঞানচর্চার আদর্শকেন্দ্র শিক্ষাঙ্গন। তাই শিক্ষাঙ্গনই হলো শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের নিকেতন, যা কেবলই শিক্ষার্থীর মনন মেধার বিকাশ ও পরিচর্যার ক্ষেত্র। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকের কতর্ব্যনিষ্ঠা নিরলস শ্রমশীলতা ও নিয়মনীতির শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষার্থীর কাছে হয়ে ওঠে প্রেরণার উৎসরূপে। *শিক্ষার জন্যই শিক্ষাঙ্গণ।* শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে সক্ষম হবেন। প্রত্যেক শিক্ষক এক একজন বীজ বপক-চাষী। বীজ হচ্ছে জ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি। বিভিন্ন ধরনের মাটি হচ্ছে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের প্রতি একজন শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব কৌতুহল জাগানো, সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা, সাফল্যকে স্বীকৃতি প্রদান॥

কৃতজ্ঞতা: পবিত্র বাইবেল ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার আলোকে ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৩। ব্যক্তির ঘটনা:

হান্না: বন্ধ্যা হান্না সন্তান লাভ করে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়। সন্তানকে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানায়। (১ সামুয়েল ১:১০-১১; ১৯-২০; ২৭-২৮)

প্রবক্তা দানিয়েল : শত বাধাবিপত্তির মধ্যে প্রবক্তা দানিয়েল ঈশ্বরের প্রশংসা করে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়। (দানিয়েল ২:২৩)

(খ) নব সন্ধি: ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

যিশুর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

১। (মথি ১১:২৫-২৭) হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমার বন্দনা করি

শিষ্যেরা প্রচার করে ফিরে এসেছেন; বহু আশ্চর্য কাজও সাধন করে ফিরে এসেছেন। আসার পর যিশু এই ভাবেই ধন্যবাদ জানান: "হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমার বন্দনা করি, কারণ স্বর্গমর্তের এই সমস্ত কথা তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছে গোপন রেখেছ আর প্রকাশ করেছ নিতান্ত শিশুদেরই কাছে। হ্যাঁ পিতা, এই তো তুমি চেয়েছিলে, এতেই ছিল তোমার আনন্দ।" "আমার পিতা আমার হাতে সমস্ত-কিছু তুলে দিয়েছেন। পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না; আবার পিতাকেও কেউই জানে না, শুধু পুত্র ছাড়া, আর পুত্র নিজেই যাদের কাছে পিতাকে প্রকাশ করতে চায়, তারা ছাড়া।" (মথি ১১:২৫-২৭)।

পিতা ঈশ্বর মানুষের চিন্তা অনুসারে কাজ করেন না; একদম যেন বিপরীত: প্রথম যায় শেষে; আর শেষ আসে প্রথমে। অহংকারীকে নম্র আর নম্রকে উচ্চে তোলা হয়। স্বর্গ রাজ্যের রহস্য বুদ্ধিমানদের কাছে নয়; সরল-সহজ যারা তাদের কাছেই প্রকাশ করা হয়।

এরপর তিনি তাঁর কাছে আসতে আহ্বান জানান। কারণ তিনি কোমল, বিনম্র হৃদয় তিনি।

২। মথি ১৫:৩৬ সাতখানা রুটি ও সেই মাছগুলো হাতে নিয়ে যিশু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানান।

ক্ষুধিত মানুষের অন্নদাতা যিশু। তিনি সেই সাতখানা রুটি ও সেই মাছগুলো হাতে নিয়ে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন আর রুটি ও মাছগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে শিষ্যদের হাতে তুলে দিলেন (মথি ১৫:৩৬)।

আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যা-কিছু আমাদের আছে তার জন্য।

৩। যোহন ১১:৪১-৪৩ লাজারের পুনর্জীবন লাভ।

তাঁর কথা পিতা শুনেছেন বলে যিশু পিতাকে ধন্যবাদ জানান। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে যিশু এবার বললেন: "পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ ব'লে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

আমাদের প্রার্থনা তিনি শুনেন; আগেই জানেন আমাদের কি প্রয়োজন। তাই আমরাও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

৪। লুক ২২:১৪-২০ সান্ধ্যভোজ প্রতিষ্ঠা: এবার তিনি হাতে একখানা রুটি নিলেন; তারপর পরশ্বেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন ----- করবে" *(লুক ২২:১৯)*।

আমরাও প্রতিনিয়ত ধন্যবাদ দিতে পারি আনন্দ সহকারে ঈশ্বরকে। *(১ থেসা ৫:১৬-১৮)*

ঈশ্বর-অনুগৃহীতা মারীয়ার কৃতজ্ঞতা নিবেদন

লুক ১:৪৬-৪৯

আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান;

আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত

আমার জন্যে সর্বশক্তিমান কত মহান কাজই না করেছেন!

পুণ্য, আহা, পুণ্য তাঁর নাম!

প্রতিনিয়ত ঈশ্বর আমাদের জান্তে-অজান্তে কত মহান কাজ করে যাচ্ছেন; আশীর্বাদ অনুগ্রহ দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা মারীয়ার মত ধন্যবাদ দিতে পারি। আমরা কি মারীয়ার মত সচেতন ও নম্র?

যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী/ব্রতিণীগণ প্রতিদিন সান্ধ্য-আরতী প্রার্থনায় মারীয়ার এই জয়গানটি করে থাকেন। সচেতনতায়? কৃতজ্ঞতা জেগে উঠে কি?

জাখারিয়ার ঈশ্বর-প্রশস্তি

লুক ১:৬৭-৭৯

ধন্য প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর। এরপর ঈশ্বরের কীর্তিগুলো বর্ণনা করেন (৬৯-৭৫)

যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী/ব্রতিণীগণ প্রতিদিন এই ঈশ্বর-প্রশস্তিটি প্রভাত-বন্দনায় করে থাকেন।

যিশু-জন্মে দূতবাহিনীর পরমেশ্বরের বন্দনা-গান

লুক ২:১৪

"জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়!" মঙ্গলময় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। এর আলোকেই "জয় পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বলোকে জয়" গানটি রচনা করা হয়েছে। পর্বীয় ও মহাপর্বীয় খ্রিস্টযাগে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে।

খ্রিস্টযাগের সময় আমরা কি গানটি উচ্চস্বরে গেয়ে উঠি? অনেক সময় আধুনিক বাদ্যের মনমাতানো ঝংকার গানকে, কণ্ঠস্বরে জব্দ করে দেয়। আবার অনেকেই চুপ করে থাকে। আবার কঠিন দাঁত-ভাঙ্গা শব্দ দিয়ে ভারতীয় জয়পরমেশ্বর রচনাটি শুরু করলে সাধারণ ভক্তবৃন্দের হয়ে যায় অসহায় অবস্থা।

দশজনের মধ্যে মাত্র একজন কুষ্ঠরোগী কৃতজ্ঞতা জানায়

লুক ১৭:১১-১৯ একজন সচেতন; আর নয়জনই অসচেতন।

১৭: ১৫ "তাদের মধ্যে একজন যখন দেখল যে, সে সুস্থ হয়ে উঠেছে, তখন সে জোর গলায় পরমেশ্বরের বন্দনা করতে করতে ফিরে এল।"

যিশুর প্রশ্ন, "দশজনের সবাই কি সেরে উঠেনি? তাহলে বাকি ন'জন কোথায়? এই বিজাতী মানুষটি ছাড়া তবে কি এমন আর কাউকেই পাওয়া গেল না যে, এখানে ফিরে এসে পরমেশ্বরের বন্দনা করবে?"

আত্মমূল্যায়ণ করি: আমরাও হয়তো কতভাবে আমাদের নিজেদের লোকদেরকেই স্বীকৃতি দিতে, প্রশংসা করতে, উৎসাহ দিতে ভুলে যাই; বা ইচ্ছা তা করেই এ থেকে বিরত থাকি অজ্ঞাত অনেক কারণেই। মণ্ডলীর পালকগণের সহায়তায় অনেক সাহায্য সহায়তা পেয়েও অনেকেই শেষে মণ্ডলীর পরিচালক/পরিচালকদের কাছে দেখা-ও করতে আসেনা! অথচ হিন্দু-মুসলিম তারা কি সন্মান-ভক্তিই না করে খ্রিস্টানদের! ফাদার-সিস্টার-ব্রাদারদের!

আদিমণ্ডলীর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা

তারা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকত। তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ সমাজ। তারা একসঙ্গে রুটিভাঙ্গার অনুষ্ঠান করত এবং প্রভুকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাত *(শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৬)*।

আদিমণ্ডলীর এই দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যেক খ্রিস্টীয় পরিবারকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। পরিবারে সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করার পর সবাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারে। জন্মদিন পালনের সময় পরিবারের এবং নিমন্ত্রিত সবাই কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে। যার জন্মদিন সে বা তার পিতামাতা/অভিভাবক ধন্যবাদ দেবার উদ্দেশ্য দিয়ে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে পারে। একসঙ্গে আহার, একসঙ্গে ধর্মীয় গান-প্রার্থনা, একে অপরকে ভক্তি-সেলাম এ সবই তো মিলন-ভ্রাতৃত্ব ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

দিয়েছ প্রতিভা বুদ্ধি-জ্ঞান
জীবনে চলার পথে ভ্রাতৃপ্রেম
আমরা তোমার আশীর্বাদ।
কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ, হে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা : সাধু পল

সাধু পলের প্রতিটি পত্রই শুরু হয় ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা-মহিমাকীর্তন দিয়ে। মাত্র কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

কলসীয় ৩:১৫-১৭

কলসীয় ৩:১৫ তোমরা পরমেশ্বরের প্রতি সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়েই থাক।

কলসীয় ৩:১৬ পরমেশ্বরের উদ্দেশে তোমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সামসঙ্গীত, বন্দনা-গীতিকা এবং ভাব-উদ্দীপ্ত গান মনপ্রাণ দিয়ে গেয়ে ওঠ।

কলসীয় ৩:১৭ তোমরা যা-কিছু বল, যা-কিছু কর, সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়; তাঁর নাম স্মরণ করে পিতা পরমেশ্বরকে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েই তা যেন হয়।

এফেসীয় ৫:২০ আর সব সময় সব-কিছুরই জন্যে পিতা পরমেশ্বরকে তোমরা ধন্যবাদ জানাও; আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নাম স্মরণ ক'রেই ধন্যবাদ জানাও।

সাধু পল সবাইকে বলে: "তোমরা সর্বদাই প্রভুতে আনন্দ কর; আনন্দই কর।" ইংরেজী ভাষায় আমাদের প্রায় সবারই জানা গান এই ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা-আনন্দকে ঘিরে: Rejoice in the Lord always! Thank you, thank you Jesus from my heart

আসুন, আমরা ঈশ্বরের মহাকীর্তির কথা, দয়ার কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করি। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই যে ঈশ্বরের শত অনুগ্রহ-আশীর্বাদ প্রতিনিয়ত আমরা পেয়ে যাচ্ছি তা অন্তরাত্মায় চেতনায় এনে তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞা জানাই।

দ্বিতীয় পর্ব:

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ: কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ নম্বর অনুসারে

১৩২৮, ১৩৫৮ Eucharist : eucharistein অর্থ ** ভাল অনুগ্রহ; কৃপা/প্রসাদ eulogein ভাল কথা, ভাল বাণী। খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্তকে খ্রিস্টপ্রসাদ বলা হয়, কারণ এ হল ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন কারণ প্রভুর ভোজের সময়, খ্রিস্টযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় ঈশ্বরের কর্মসকল: সৃষ্টি, মুক্তি পবিত্রীকরণ স্মরণ করা হয়। প্রসঙ্গত খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা এক ও চার।

১৩৫৮ খ্রিস্টপ্রসাদকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে: কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ও পরমপিতার মহিমাস্তুতি।

খ্রিস্টযাগের সময় বিশেষভাবে পর্ব মহাপর্বের সময় ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি-বন্দনা করার পর ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করা হয়। ঈশ্বরের বাণী ঘিরে ধর্মোপদেশ। আমরা বুঝতে পারি প্রভুর বাণী কত যে সক্রিয়; জীবনদায়ী; প্রাণসঞ্চারী। প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানানো হয় খ্রিস্টযাগের অর্ঘ্য প্রস্তুতির সময়। রুটি ও দ্রাক্ষারস হাতে নিয়ে পৌরহিত্যকারী বলেন: ---- এ হবে জীবনময় খাদ্য। ----- এ হবে জীবনময় পানীয়; তখন উপাসকমণ্ডলী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-প্রসংশা জানিয়ে বলে: "ধন্য হে পরমেশ্বর, যুগ যুগ ধরে তোমার জয় হোক।" বন্দনা (Preface) ঈশ্বরের ধন্যবাদ বন্দনা। এই বন্দনার চূড়ান্ত পর্যায় হল স্বর্গদূতবাহিনী ও সাধু-সাধ্বীদের সাথে ঈশ্বর-স্তুতিগান গাওয়া। সকলেই গেয়ে উঠে: পুণ্য পুণ্য পরমেশ্বর।

১১০৩ পবিত্র আত্মা: উপাসনা-অনুষ্ঠান সর্বদা ইতিহাসে ঈশ্বরের পরিত্রণমূলক কাজের প্রতি নির্দেশ করে। খ্রিস্টপ্রভু আমাদের জন্য যা-কিছু করেছেন, তা সবই বাণীঘোষণা-অনুষ্ঠানে পবিত্র আত্মা সমবেত জনগণকে "স্মরণ" করিয়ে দেন। উপাসনার মধ্যদিয়ে জনমণ্ডলী পরমেশ্বরের আশ্চর্য কার্যাবলী স্মরণাত্মক-প্রার্থনায় "স্মরণ" করে। এইভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর স্মৃতি জাগ্রত ক'রে পবিত্র আত্মা খ্রিস্টমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করেন ধন্যবাদ ও প্রশংসাগানে (মহিমাস্তুতি doxology)

যিশুর উদাহারণ: ২৬০৩, ২০৬২

২৬০৩ মঙ্গলসমাচার লেখকগণ যিশুর প্রার্থনার কথা উল্লেখ করেছেন: এখানে দু'টো তুলে ধরি: মথি ১১:২৫-২৭, লুক ১০:২১-২৩ এখানে যিশু ঈশ্বরকে "পিতা" বলে সম্বোধন করেন; তাঁর নামের বন্দনা করেন।

২০৬২ যিশুর গোটা জীবনটাই ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আরাধনা।

২৮০৭ তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তোমার নাম পূজিত হোক। ঈশ্বরের আরাধনায় এই আবেদনটি কোন কোন সময় প্রশংসা এবং ধন্যবাদের অর্থ বহন করে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা ও স্তুতি নিবেদন করার লক্ষ্যেই doxolog; এরপর মহারতির গানটি রচনা করা হয়েছিল। "তোমার নামের হোক মহিমাগান ----।" আর আরতী তো ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা ও মহিমাই প্রকাশ করে।

ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন রয়েছে ২২৪, ৭৯৫, ৯৮৩, ১১৬৭, ১৩৩৩, ২৭৮১

২২৪: ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁকে ভালবাসার অর্থই হ'ল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জীবনযাপন করা।

৭৯৫ "আসুন আমরা আনন্দ করি এবং ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমরা যে খ্রিস্টভক্ত হয়েছি তা নয়, বরং আমরা স্বয়ংখ্রিস্টই হয়ে উঠেছি" (সাধু আগষ্টিন)

৯৮৩ "খ্রিস্টমণ্ডলীতে যদি পাপ ক্ষমা করার ব্যবস্থা না থাকত, তাহলে পরকালের জীবন বা অনন্ত মুক্তির কোন আশা থাকত না। আসুন, আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই কারণ খ্রিস্টমণ্ডলীতে তিনি এই মহাদান দিয়েছেন" (সাধু আগষ্টিন।)

১১৬৭ রবিবার প্রভুর দিন। বিশ্বাসীবর্গ ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করতে এবং খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে এবং এইভাবে তারা প্রভু যিশুর যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান ও মহিমা স্মরণ করে এবং ধন্যবাদ জানায় পরমেশ্বরকে।

১৩৩৩ খ্রিস্টযাগের সময় অর্থনিবেদনের সময় "মানুষের শ্রমের ফল", বিশেষভাবে "ভূমি থেকে উৎপাদিত খাদ্য" ও আঙ্গুর-রস" সৃষ্টিকর্তার দান, সেই রুটি ও দ্রাক্ষারসের জন্য" সৃষ্টিকর্তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

২৭৮১ প্রভুর প্রার্থনা। দু'টি অংশ: প্রথম অংশ "হে আমাদের স্বর্গস্ত পিতা --- হোক।" আরাধনাপূর্ণ প্রশংসা। দ্বিতীয় অংশ: ঈশ্বরের কাছে অনুনয়।

২৬৩৮ যেকোন সময় কৃতজ্ঞতাসূচক প্রার্থনা: আবেদনসূচক প্রার্থনায় যেমন, তেমনি প্রতিটি ঘটনা ও প্রয়োজন কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্য হয়ে উঠতে পারে। সাধু পলের পত্রগুলো প্রায়ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে শুরু ও শেষ হয়। সবকিছুতে ধন্যবাদস্তুতি জানাও- খ্রিস্ট যিশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।" "তোমরা প্রার্থনা-সভায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ ও স্তুতি জানিয়ে প্রার্থনায় জেগে থাক" (১ থেসা ৫:১৮) (কলসীয় ৪:২)

রাজশাহী ডায়োসিস প্রভুরই দান
প্রগতির শক্তিতে আছে তার প্রাণ;
রাজশাহী প্রভুর আশীর্বাদ।

তৃতীয় পর্ব: বাস্তবতার নিরিখে চেতনায় কৃতজ্ঞতা

আমি যে এই পৃথিবীতে এসেছি, আমার বিদ্যমানতা; এটাইতো ঈশ্বরের এক মহাদান। বাবা মা পেয়েছি, এটা ঈশ্বরের এক মহাদান। পুনরায় বলি, আমি যে জীবিত আছি; সুস্থ আছি, কর্ম করতে পারছি এসবই তো আমার কাছে ঈশ্বরের দান। ব্যক্তি জীবনের আরো অনেক কিছুই সব কিছুই আমার নিজের বলে নয়; ঈশ্বরই আমাকে, আমাদের প্রত্যেককে দিয়েছেন এবং দিয়েই যাচ্ছেন। ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ আমি কি একবারও আমার চেতনায় নিয়ে আসি? নাকি, জেগে উঠি-কাজ করি-খাইদাই-ঘুমাই, এই ধারা নিয়ে জীবন কাটাই? পক্ষান্তরে প্রাত্যহিক সত্যগুলোকে আমি যদি চেতনায় নিয়ে আসি, তবে তো প্রথমেই আমার মাথা নত হবে এই ভেবে যে, আমার সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের মহাদান! নম্র অন্তর বলে উঠবে: তোমায় প্রভু ধন্যবাদ! হয়তো বা সাধু পিতরের মত বলে উঠব: "প্রভু, আমি যে পাপী!"

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ : সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞতা অন্তরের ব্যাপার, বলা যায় অন্তরের অন্তঃস্থলের ব্যাপার। আর ধন্যবাদ হল অন্তরের সেই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। আর এই বহিঃপ্রকাশ বিচিত্র! এই প্রকাশের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি জড়িত। কান্নার মধ্যদিয়ে, বিস্ময়-মাখা চাহনীর মধ্যদিয়ে, উজ্জ্বল মুখাবয়বের মধ্যদিয়ে, করমর্দনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ সেলামের মধ্যদিয়ে. আলিঙ্গনের মধ্যদিয়ে, মুচকি হাসির মধ্যদিয়ে, কিছু উপহার দিয়ে, এমনকি নীরবতার মধ্যদিয়েও; আরো হাজারো উপায়ে হতে পারে অন্তরের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। যখন কেউ জাগ্রত চৈতন্যে উপলব্ধি করে যে, তার প্রতি অনেক অনেক কল্যাণ করা হল, সমর্থন, স্বীকৃতি, সাহায্য-সহযোগিতা, বিপদে আশ্রয় ইত্যাদি এবং সে তা স্বীকার করছে তখনই তার মধ্যে জেগে ওঠে নম্রতায়ভরা এক অনভূতি (feeling) যা বর্ণনা ক'রে বুঝানো কঠিন। অন্তরের অনুভূতি জাগবে তখনই যখন অন্তরের অন্তঃস্থলের যে চৈতন্য তা জাগ্রত হয়। তবে মানুষের চেতনা/চৈতন্য কি জাগ্রত থাকে? "আমি জাগিয়া ঘুমাই নিশিদিন প্রভু, আমারে জাগাবে কবে?" (চলবে)

একটি হৃদয় বিদারক দূর্ঘটনা এবং সমাজে ফকির দরবেশদের ভূমিকা

ডা. এফ রোজারিও

আমার ছাত্র জীবন প্রায় শেষ প্রান্তে। এমনি এক সময়ে স্নেহময়ী মা পিত্তথলির ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে অসময়ে সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। মা হারা ছয় ভাইবোন সকলেরই মন ভীষণ খারাপ, একেবারে নিষ্প্রাণ! যেন তৈলবিহীন প্রদীপ, শলতা নিভু নিভু অবস্থা। ঐ সময় পূজার দুই একদিনের ছুটি পেয়ে মনে মনে স্থির করলাম এই দুই দিন ছোট ভাই বোনদের সান্নিধ্যে গ্রামে গিয়ে গল্পগুজবে বাবার সাথেও কিছুটা সময় কাটিয়ে আসি।

কথা মত কাজ। কোন এক ভোরে সদরঘাট থেকে জোড়া দুই জলডুগী আনারস, বাবার পছন্দের রয়েল বেকারীর গোটা দুই পাউরুটি, শিশু অবস্থায় টাইফয়েডে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ছোট ভাই এর জন্য কিছু চকোলেট কিনে বান্দুরাগামী মুন্নী লঞ্চে চেপে বসি। ঐসময়ে পাঁচ ছয় ঘন্টা লঞ্চে বসে থাকা আমার কাছে খুব একটা খারাপ না, বেশ ভালোই লাগতো। স্বল্প পরিসরে লম্বা সময়টুকু এলাকার পরিচিত অপরিচিত বিভিন্ন ধরনের বন্ধুবান্ধব, নিকট বা দূর আত্মীয় অনাত্মীয় সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ আলাপচারিতায় কোথা দিয়ে সময় পার হয়ে যেতো। তার উপর বিভিন্ন ধরনের মজার মজার আকর্ষণ! কত রকম ফেরিওয়ালা নানান ধরনের গল্পবই, কিতাব বিক্রেতা, জুতা পালিস, দুই চারজন প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক থেকে শুরু করে ঝালমুড়ি, চানাচুর, গরম গরম ডিম, পাউরুটি, কলা, 'ছিল্যা কাইট্যা লবণ দ্যা দিমু, আমড়া ওয়ালা, আরো কত রকম মুখরোচক স্ন্যাক্স। ফেরিওয়ালাদের নানান স্বরে হাকডাক অঙ্গভঙ্গি এর মধ্যে যদি এক আধজন উঠতি রাজনৈতিক নেতা, পাতিনেতা লঞ্চের আপার ক্লাসে ভ্রমণসাথি হয়ে যেতো তাহলে তো কথাই নাই। দেশ উদ্ধারে মজাদার গালভরা 'বক্তিমা (এই ধরনের গালভরা গল্পকে আমি 'বক্তিমা বলি বক্তৃতা বলি না) চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করে শুনতে মজাই লাগতো, সময়ও বেশ কেটে যেতো। আবার অবাক হওয়ার মত কিছু হয়েও যেতো যেমন একটু আধটু ঘুম ঘুম ভাবের মধ্যেই দেখতাম কোথা থেকে গরম গরম এক কাপ চা অথবা ঝাল মুড়ির প্যাকেট একেবারে মুখের সম্মুখে এসে হাজির। অবাক বিস্ময়ে তাকালেই সাথে সাথে দূর বা কাছে থেকে আওয়াজ আসতো "ভাই খান খান আমি দিছি" ! কত যে আন্তরিকতা ভালোবাসা! কার না ভালো লাগে? আরো এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল আট দশ বছরের এক ছেলের মন মাতানো কণ্ঠে উপমহাদেশের কালজয়ী শিল্পী ভূপেন হাজারিকার বিশ্ব নন্দিত গান "মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, একটু সহানুভূতি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু"! সেই মর্মস্পর্শী গান। ছোট্ট ছেলেটি সুন্দর অঙ্গভঙ্গি আর দুই হাতের তালুতে সুরের তালে তালে এক মোহনীয় শব্দ সৃষ্টিতে ঐ অঞ্চলে জনপ্রিয় মুন্নী লঞ্চের যাত্রীদের মন জয় করে নিয়েছিল।

এই সব আনন্দ উপভোগের মধ্যে সহসা সুকানীর হাকডাক পড়ে যেতো "গোল্লা গোল্লা। অর্থাৎ আমার গন্তব্যস্থল গোল্লা ঘাটে পৌঁছে গেছি। তীরে ভিড়ার সাথে সাথে ঘাটের মাঝিরা হুরমুড় করে লঞ্চে উঠে পরিচিত অপরিচিত যাত্রীদের মালপত্র মাথায় করে তড়িঘড়ি করে নেমে যেতো তাদের আয় রোজগারের আশায়। ঘাটের পরিচিত এক মাঝি নাম ফৈজা। ছোট বেলা থেকে সারাক্ষণই লঞ্চঘাটে থাকে। এলাকার সব খবরাখবর তার কাছে পাওয়া যেতো। সে ছিল ঐ সময়ের বর্তমান মডার্ন জগতের 'গুগোল'। কি জানতে চান? শুধু প্রয়োজন ওর পেটে একটা টোকা বা ক্লিক। লোকজন তাকে ঐসময় ডাকাত দলের খুইজাল বলেও কানাঘুষা করতো। আমার হাতের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়েই জিজ্ঞাসা করে "স্যার আর আছেনি? নাই বলতেই সে লঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে গড়গড় করে নেমে পড়ে। আমিও ওর পিছু পিছু রওনা দেই। পথে চলতে চলতে কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই গ্রামের খবরাখবর বলা আরম্ভ করে দিল। "স্যার খুব খারাপ এক সংবাদ"! "কি সংবাদ?"। বলতেই গড়গড় করে বলে উঠে "আজ দুই দিন অইলো সুশান্তকে পাওয়া যাইতাছে না! "পাওয়া যাচ্ছে না মানে? কোথাও হয়তো বেড়াতে গেছে!

"না স্যার। নদীর ঘাটে গেরামের অনেক পোলাপাইনগো সাথে গোসল করবার আইয়্যা ডিগবাজি খাইতে ছিল। পোলাপাইন মজা করতে করতে হঠাৎ দ্যাহে সুশান্ত একটা ডিগবাজি খাইয়্যা কিছুক্ষণ পানিতে উলটপালট কইরা আর উঠতে পারছে না নদীতে ডুইব্যা গেছে"!

"তুই দেখেছিস? ওর সাথে আর কে কে ছিল? তোরা খোঁজ করিস নাই?"

"আপনার ভাই বিজুর সাথে ধনু, পলাশ, তরুন, মানিক ওরা সবাই ছিল। ঘন্টা খানেক পর গেরামের মাইনস্যে গাঙ্গে নাইম্যা জাল দিয়া খোঁজাখুঁজির পরও না পাইয়্যা হোবিন্দপুর থন ডুবুরি আইন্যাও কোন কাম অয় নাই। হেরে আর পাওয়া গেলো না। সংবাদ পাইয়া কুসুম হাটির ফকির বাড়ীর ছোট ফকিরবাবা আইস্যা ধ্যানে বইছিলো। আইজ আবার সন্ধ্যায় বড় ফকির ভাঁড়ে বইবো। বড় ফকিরবাবা পরহেজগার মানুষ।

"ফকির ধ্যান করে বলে কি?

"হ্যে ক্যয় সুশান্তকে ইচ্ছামতীর গঙ্গিমা কুমের (গভীর জলে) মধ্যে ধইরা রাইখ্যা দিছে। তয় সে এখনও জীবিত আছে; গঙ্গিমারে বিশ হাজার টাকা ১০ মন চাইল আর গঙ্গিমার জন্য কিছু ফলফলাদি দিলে গঙ্গিমা খুশি অইয়্যা সুশান্তকে জ্যান্ত অবসস্থায় ছাইড়্যা দিবো। তা না অইলে ওরে বাঁচান যাইব না"।

সুশান্তর খবরটা শুনে মনটা খুব বিষন্ন হয়ে ওঠে এবং ফকিরের উদ্ভট ফকরামীর কথায় রাগে দাঁত কটমট করে উঠলো। বাড়ী আসার আনন্দটাই যেন হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেলো। ফৈজার সব কথায় বিশ্বাস হলো না। ওর ফকির বিশ্বাসেও কোনো আঘাত করলাম না। ওর সাথে শুধু হুম হুম করে বাড়ীর দিকে এগুতে লাগলাম। শুধু ওকে জিজ্ঞাসা করলাম "বিজু ওরা কোথায়?"

স্যার, আন্দাজ করি ওরা সব খেলার ময়দানে আছে। চলেন দেহা অইলেও অইতে পারে।

লঞ্চ ঘাটে নেমেই ছোট বড় দুইটা খেলার মাঠ পার করেই আমার পৈত্রিক বাড়ী। আশ্বিন কার্তিক মাস বর্ষাস্নাত গ্রামের রাস্তাঘাট। কাদা পানিতে চ্যাপ চ্যাপ করছে। প্যান্ট গুটিয়ে জুতা জোড়া অঙ্গুলিতে বাজিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলাম। সত্যিই দূর থেকে দেখি মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিজু আরো আটদশ জন ওর বয়সী ছোটবড় ছেলেরা গোল হয়ে

কথাবার্তায় ব্যস্ত। আমাকে দেখে সবাই এগিয়ে আসে অবাক বিস্ময়ে ওদেরকে ফৈজার কাছ থেকে পাওয়া সুশান্তর খবরটা জিজ্ঞাসা করতেই সকলের চোখে মুখে গভীর এক বিষন্নতার ছাপ উপলব্ধি করি। সবাই কান্না কান্না ভাব। বিজু ঘটনাটা সুন্দর বর্ণনায় বলে "আমাদের পরীক্ষা শেষ। তাই গ্রামের নানান বয়সের ছেলেরা আমরা একসাথে প্রায় প্রতিদিনই স্নান করি। ঐদিনও ছিল তাই। ছোট বড় ছেলেপেলে সবাই মিলে পানিতে ডিগবাজি খাচ্ছিল। আমি সময়মত দুপুরের খাবার এবং প্রার্থনা আছে বলে বাড়ী চলে যাই। খাবার খেয়ে এবং দুপুরের প্রার্থনা শেষ করে মায়ের সাথে কথা বলছি। এমন সময় ঘাটে হইচইপূর্ণ চেচামেচি শুনে আমিও নদীর ঘাটে গিয়ে শুনি সুশান্তকে পাওয়া যাচ্ছে না। সুশান্তর জন্য ভয়ে মনপ্রাণ কেঁদে উঠলো। বহুলোক খোঁজাখুঁজি করেও ওর আর হদিস পাওয়া গেলো না।"

বিজুর কাছে খবরটা ভালো করে যাচাই করে ওদের বললাম "তোরা মাঠে অপেক্ষা কর আমি বাড়ীতে ব্যাগটা নামিয়ে বাবার সাথে দেখা করেই চলে আসব। আমি দেখতে চাই তোরা কোথায় পানিতে ডিগবাজি খাচ্ছিলি?" বাড়ীতে গিয়েও দেখি বাবাকে ঘিরে পাড়াপর্শী সবার একই আলাপ সুশান্তকে নিয়ে। ভীষণ মন খারাপ সবার। আমাকেও একই প্রশ্ন সুশান্তর কথা শুনেছি কিনা? বললাম হ্যাঁ। বাবাকে প্রণাম করে ব্যাগটা রেখে বাবাকে বলি আমি একটু ছেলেদের নিয়ে দেখে আসি ওরা কোনখানটায় লাফালাফি ডিগবাজি করছিল। তাহলে বুঝতে পারব সুশান্তর কি হয়েছে? ঠিকই মাঠে এসে বিজুকে বলি "আমার সাথে চল দেখি কোথায় ওরা লাফালাফি করতে ছিল?" ইছামতি নদীর কিনারায় চলে গেলাম। প্রচুর খরস্রোতা নদী। আশ্বিন-কার্তিক মাস মরকের মাসও বলা চলে দুই একটা মৃত গরু ভেড়াও ভেসে যেতে দেখি। বিজু আমাকে দেখিয়ে দিলো ওদের লাফালাফি করার স্পটটা। আমি হাঁটু পানিতে নেমে দেখলাম নদীর কিনারে একপাশ বেশ গভীর। খানিক পাশেই আবার চত্তাল অর্থাৎ বালুর চর। ধনু আমাকে দেখালো "সুশান্ত শেষবারের মত এই খানটায়ই ডিগবাজি খেয়ে আর উঠতে পারে নাই। পানিতে নেমে বুঝলাম সুশান্ত না জেনে চালে জাম্প করছে বিধায় ওর মাথা বালুর চরায় প্রচণ্ড আঘাতে ঘাড়টা ঘুরে গিয়ে সার্ভাইকেল বোন অর্থাৎ ঘাড়ের হাড় ভেঙ্গে যায়। সাথে মনে মনে একটা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস করে নিলাম ওর স্পাইনাল কর্ড ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারপর কি হতে পারে ভেবে পানি থেকে উঠে পরলাম। (চলবে)

আমার একটি মাত্র সন্তান

বীনা খ্রীষ্টিনা রোজারিও

"আমার একটি মাত্র সন্তান, যাকে একটি ফুলের টোকা পর্যন্ত দেইনি তাকে এমন কথা বলেছে, আমি ওকে দেখে ছাড়ব, ওকে বুঝিয়ে দেব, কত ধানে কত চাল।" রিমনের এ কথাই তার একমাত্র ছেলে রাতুলের জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। রিমন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারী, স্ত্রী অহমিকাও ভাল বেতনের চাকুরী করে। উত্তরাধিকার সূত্রেও সে অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়েছে। তাই তার টাকা পয়সার অভাব নেই। স্ত্রী অহমিকার সাথেও রয়েছে রিমনের মধুর সম্পর্ক। রাতুল যেন তাদের সংসারে হীরের টুকরো, সাত রাজার ধনের চেয়েও মূল্যবান সম্পদ। রাতুলের প্রতি আদর, যত্ন, ভালবাসা কোন কিছুরই কমতি ছিল না। ছিল শুধু শাসনের অভাব, কষ্ট সহ্য করার অভিজ্ঞতার অভাব। পড়ালেখায়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অন্য দশটি ছেলের চেয়ে রাতুল এগিয়ে। নম্র , ভদ্র, ধার্মিকতায়, সব দিক দিয়েই উত্তম চরিত্রের, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একজন যুবক, যাকে সবায় স্নেহ করে, আদর করে ও ভালবাসে। বাবা-মা একমাত্র আদরের সন্তানের জন্যে ঢাকা শহরে ফ্ল্যাট কিনেছে, গ্রামেও যথেষ্ট জায়গা কিনেছে বাড়ি করার প্ল্যান নিয়ে, যাতে তারা যখন কাজ করতে পারবে না, বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন ছেলেকে যেন কষ্ট করতে না হয়। ছেলেকে কোন রকম কষ্ট করার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তারা দেয়নি।

রিমন- অহমিকা সব সময় শুধু ছেলের সুখের কথাই চিন্তা করেছে। আরো দু'একটি সন্তান নিলে রাতুল ভাগে কম পাবে, সম্পত্তি ভাগ হবে, আদর-ভালবাসা ভাগ হবে সে চিন্তা করে তারা আর সন্তান নেয়নি। রাতুলও বাবা-মা ও আত্মীয় পরিজনদের ভালবাসায় ভালভাবে বেড়ে উঠছিল। শিশুশ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কোন ক্লাশেই প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি। একাদশ শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা ভালই লিখেছে। এরমধ্যে রিশা নামের একটি মেয়ের সাথে রাতুল প্রেমের সম্পর্কে জড়ায়। রিমন-অহমিকা তা জানতে পারে এবং এ সম্পর্ককে মেনে নেয়, মেলামেশা করতে, বাসায় আসতে কোন বারণ করেনি। ছেলের এক বন্ধুর মা বলেছিল, বাঙালি কালচারে প্রকাশ্যে এভাবে মেলামেশা করা ঠিক নয়, এ কথার উত্তরে রিমন বন্ধুর মাকে কড়া কথাটি বলেছিল।

রিমন- অহমিকা রিশাকে ছেলের বউ করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু বিধিবাম। মেয়েটি রাতুলকে ঠকায়, দু'বৎসর প্রেম করার পর রাতুলকে বাদ দিয়ে অন্য ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করে। রাতুল তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, তাকে বিষন্নতায় পেয়ে বসে। বাবা-মা বিষয়টি জানতে পেরে অনেক বুঝায়, কিন্তু ছেলে এ কষ্ট কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, কারণ কষ্ট সহ্য করার অভিজ্ঞতা তার নেই, সে শুধু পেয়েছে ভালবাসা আর আদর -সোহাগ। তাই সে তার কষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, বাবা-মায়ের বুক খালি করে নিজ জীবনটি শেষ করে দেয়। রাতুলের মৃত্যুর পর এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। রাতুল জিপিএ-ফাইভ পেয়েছে, কিন্তু এ রেজাল্ট সে জেনে যেতে পারেনি। রাতুলের বন্ধুদের কাছ থেকে এ রেজাল্টের সংবাদ পেয়ে রিমন-অহমিকা রাতুলের বন্ধুদের ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

রিমন-অহমিকা একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে হাহাকার করছে, তাদের এত সম্পদ কি হবে, কে ভোগ করবে? যে সন্তানকে এত আদর -যত্ন করেছে, অসুস্থতায় কত নির্ঘুম রাত্রি যাপন করেছে সে সন্তানতো তাদের কথা চিন্তা করেনি, শুধুমাত্র তার প্রেমিকার কথাই চিন্তা করেছে। বাবা-মা ১৯ বৎসর ছেলেকে ভালবাসা দিয়েছে, ছেলের জন্য সব করেছে, প্রয়োজনীয় সব দিয়েছে, কিন্তু রিশার দু'বৎসরের ভালবাসা সব শেষ করে দিল। বাবা-মার কি দোষ ছিল, কেন এমন হলো? আরো দু'একটি সন্তান থাকলে কি আজ এভাবে শূন্যতায় ভাসতে হত?

ঘটনা- ২: প্রান্ত বাবা-মায়ের একমাত্র

সন্তান, অনেক আদরের। বাবা প্রিতম সারা জীবন প্রবাসে কাটিয়ে দেয় ছেলে প্রান্তর সুখের বিষয় চিন্তা করে। মা দেশে থেকে ছেলের যত্ন করেছে। লেখাপড়ায় প্রান্ত খুবই ভাল, মেধাবী ছাত্র, শিক্ষকগণও স্নেহ করেন। বাবা-মা আদর যত্ন কম করেনি, কোন কিছুর অভাব অনুভব করতে দেয়নি। ছাদ পিটিয়ে গ্রামের বাড়ীতে বড় অট্টালিকা তৈরী করেছেন, বাড়ীর উঠোনটিও পাকা করেছে একমাত্র ছেলের জন্যে। এই অট্টালিকায় দশ জন সন্তান স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারত। ঢাকা শহরে থেকে স্বনামধন্য কলেজ থেকে প্রান্ত ডিগ্রী পর্যন্ত পড়শোনাও করেছে। মা একজন সেবিকা হয়েও বিয়ের পর কোন হাসপাতালে চাকুরী করেনি শুধু ছেলের যত্নের যাতে কোন অবহেলা না হয়। কথায় বলে অতি আদরে বাদর হয়। তেমনি হয়ে উঠল প্রান্ত। কোন এক মহিলার সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। মহিলাটি স্বামী ও সন্তানকে ছেড়ে প্রান্তর সাথে বিয়ে হতে রাজী না হওয়ায় প্রান্ত নিজের জীবন শেষ করে দেয়। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে প্রিতম ও প্রতীভা শোক সাগরে ভাসতে লাগল। কেন এমন হলো? আরো দু'তিনটি সন্তান থাকলে কি আজ এভাবে শূন্যতায় ভাসতে হত?

ঘটনা-৩: সুইট পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। শুধু বাবা-মা নয় ওর বাবারা চার ভাই, চার ভাইয়ের সংসারে সুইট একমাত্র ছেলে সন্তান। কাজেই কেমন আদর- যত্নে বড় হয়েছে বুঝতে কারো বাকি নাই। সুইট এর চেহারা, গায়ের রং ওর নামের সার্থকতা এনেছে। দেখতে যেমন সুন্দর, ওর অন্তরটাও তেমনি পবিত্র। সুইটের বাবা সার্থক আমেরিকা প্রবাসী, কাগজপত্র ঠিক হলে সুইট ও তার মা সেজুঁতিকা চলে যাবে স্বপ্নের দেশ আমেরিকায়। গ্রামের বাড়িতে শহরের সব সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও সেজুঁতিকা ছেলেকে নিয়ে ঢাকা শহরে থাকছে। শ্বশুর মশাই সেজুঁতিকার বিয়ের আগেই স্বর্গধামে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বামী আমেরিকা থাকে বলে টাকার গরিমায় সেজুঁতিকার যেন মাটিতে পা পড়ে না। বাড়িতে আছেন বৃদ্ধা শাশুড়ি, ভাসুর, দেবর, জাঁ ও তাদের সন্তানেরা। কারো সাথে সেজুঁতিকার কোনরূপ সম্পর্ক বা যোগাযোগ নেই। কাউকে কিছু না বলে ছেলেকে নিয়ে শহরে চলে গেল। হঠাৎ দু'জনই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলো। শত চেষ্টা করে সেজুঁতিকা সুস্থ হলেও সুইট সুস্থ হতে পারল না। বাড়ির কেউ সুইটের অসুস্থতার কথা জানতে পারল না। যেদিন জানতে পারল, বাড়ির সবাই রওনা হলো অতি আদরের একমাত্র ছেলে সন্তান, কারো ভাই, কারো ভাইস্তা, কারো নাতি সুইটকে দেখার জন্যে কিন্তু পথিমধ্যে ওর মৃত্যু সংবাদে সবাইকে ফিরে আসতে বাধ্য করল। সুইটকে গ্রামের লোকেরা একনজর দেখার জন্যে বাড়িতে ভিড় করল। তারা একসময় ফিরে যাবে, কয়েকদিন হয়তো আপসোস করবে দেবদূতের মত সুইটকে, তারপর ভুলে যাবে, কিন্তু সার্থক আর সেজুঁতিকা কি ভুলতে পারবে তাদের একমাত্র সন্তানকে? সার্থকতো মৃত ছেলের মুখটি পর্যন্ত দেখার সুযোগ পেল না। কাগজপত্র ঠিক হয়নি বলে সে ছেলেকে দেখার জন্য দেশে আসতে পারল না, দেশে আসলে আর যেতে পারবে না, তাই আসেনি। এ পুত্রশোক সইবে কিভাবে?

ঘটনা-৪: স্বার্থ ও শ্রেষ্ঠার একমাত্র মেয়ে শর্মিষ্ঠা। বাবা প্রবাসে থাকে মেয়ে ও স্ত্রীর সুখের জন্যে, ওদের মুখে একমুঠো অন্ন ও বিস্তর সুখ দেবার জন্যে। বাড়ি থেকে স্কুলে আসবে এতে মেয়ের আসা-যাওয়ায় কষ্ট হবে, তাই মেয়েকে হোষ্টেলে রাখল। শিশু অবস্থায় মেয়েটি অসুস্থ হলে বাবা-মা উভয়ই কত রাত যে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে একমাত্র আদরের মেয়ে শর্মিষ্ঠার জন্যে তার কোন হিসেব নেই। মাত্র তের বৎসর বয়সেই একটি ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়ায়, আর একদিন ব্যাগ নিয়ে ছেলের বাড়িতে গিয়ে উঠে। শর্মিষ্ঠা মাত্র অষ্টম শ্রেণিতে আর তার প্রেমিক মাত্র ১০ম শ্রেণিতে পড়ে। কারো বিয়ের বয়স হয়নি, বিয়ে যে কি সম্ভবত তাও জানেনা, অথচ ছেলের সাথে থাকার জন্য পাগল। মা ও আত্মীয়েরা বুঝিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসল, তারা বলল বিয়ের বয়স পূর্ণ হলে এই ছেলের সাথেই তাকে বিয়ে দিবে, কিন্তু মেয়ে সে কথা বিশ্বাস করল না, পরদিন গলায় ওড়না পেঁচিয়ে জীবন শেষ করে দিল। এখানে কি বাবা-মায়ের কোন ভূমিকা নেই? আজ তো তারাই শূন্য বুকে হাহাকার করে দিন কাটাচ্ছে। আরো সন্তান থাকলে কি এই হাহাকার থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যেত না?

ঘটনা-৫: তনয় ও তনুজার একমাত্র ছেলে তন্ময়। দরিদ্র পরিবারে তনয় রিক্সা চালিয়ে আর তনুজা অন্যের বাড়ীতে কাজ করে কোনমত সংসার চালায়, কিন্তু একমাত্র সন্তান তন্ময়ের প্রতি ভালবাসা ও যত্নের কম করেনি। অতি যত্নে ছেলেকে বড় করে, লেখাপড়া শিখিয়ে ভবিষ্যৎ আনন্দের সুখস্বপ্ন দেখে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাবা তনয় অতি অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে। মা অন্যের বাড়ীতে কাজ করে, বাপের বাড়ীর সম্পত্তি এনে ছেলেকে পড়ায়। কিন্তু তন্ময় কলেজে পড়ার সময় বড়লোকের মেয়ে তিতিকার প্রেমে পড়ে। মা পাড়া-পড়শী ও আত্মীয়দের সহায়তায় তিতিকাকে ছেলের বউ করে ঘরে আনে। কিন্তু তিতিকা শাশুড়িকে মোটেই পছন্দ করে না, গরীব বলে সব সময় কটু কথা বলে, ঠিকমত খাবার দেয়না, ঔষধপত্র দেয় না। ছেলেও তিতিকার কথা শুনে গর্ভধারিণী মায়ের সাথে অন্যায় আচরন করে, খাবার দেয় না, ঔষধপত্র দেয় না। মা যেন পরিবারে আপদ, তাকে দূর করে দেবার পরিকল্পনা করে। একদিন তিতিকার কথায় গর্ভধারিনী মাকে শেষ করে দেবার ইচ্ছায় মায়ের হাত-পা বেঁধে ছুরি দিয়ে মারতে যায়, এমনি সময় স্বর্গীয় পিতা ইসহাককে যেভাবে বাঁচিয়েছিলেন সেভাবে তনুজাকে বাঁচিয়ে দিলেন, তাদের এক আত্মীয় এসে দরজায় টোকা দেয়। তন্ময়ও তিতিকা ছুরি লুকিয়ে রেখে তনুজার হাত-পা খুলে দিয়ে পরে দরজা খুলে। তনুজা এ পরিবারে কিভাবে থাকবে! অতি যত্নে, তিল তিল করে টাকা জমিয়ে, বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে টাকা চেয়ে এনে যে ঘরটি বানিয়েছিল সে ঘর ছেড়ে মিশনে সিস্টারদের স্মরনাপন্ন হয়। সিস্টারগণ তাকে আশ্রয় দেয়। এখন সে নিজের বাড়ী ছেড়ে সিস্টার বাড়ীতে আছে। তনুজার কি ইচ্ছে হয়না নিজ বাড়ীতে, নিজ হাতে গড়া বাড়ীতে ছেলে, ছেলে বউ ও নাতি-নাতনি নিয়ে থাকতে?

ঘটনা - ৭ : আট বছরের ছোট মেয়ে ত্রিনয়নি, একা একা থাকে, খেলার বা কথা বলার সাথী নেই, আর একটি ভাই বা বোনের আশায় তার মাকে বার বার বলার পরও যখন কাজ হয়নি তখন বলল, আমার ঠাকু আর আমার দিদিমা ৮টি করে সন্তান নিতে পারলে তুমি কেন আর একটি নিতে পারছ না? আমি শুধু বললাম, মেয়ের কাছ থেকে আর কি লজ্জাজনক কথা শুনবে? অবশ্য সে মা ঐ সন্তানকে পরে একটি ছোট বোন উপহার দিয়েছে।

উপরোক্ত সবগুলো ঘটনাই সত্য ঘটনা, আর সব কয়টি ঘটনা আমাদের খ্রিস্টান সমাজের। এ আমাদের বর্তমান খ্রিস্টীয় সমাজ। এরূপ আরো অনেক সত্য ঘটনা আছে যা লিখতে থাকলে আর শেষ হবে না। আজ আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে যারা একটি মাত্র সন্তান নিয়ে বসে আছে। যারা একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সন্তানহারা অবস্থায় হাহাকার করছে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কেন আপনার সন্তানকে ভাই-বোন একসাথে বাস করার, বড় হওয়ার, খেলা করার, স্কুলে যাওয়ার, সহভাগিতার জীবন গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন? আসুন যাদের সুযোগ আছে ত্যাগস্বীকার করি, কষ্ট করি, আরো সন্তানের জন্ম দিয়ে সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টিকাজে সহায়তা করি। আপনার একটিমাত্র সন্তান, ধর্মীয় কাজে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার হতে কাকে দেবেন? এমনিভাবে চলতে থাকলে গির্জাঘর কি ফাদারশূন্য হয়ে যাবে না? আপনি ধর্মীয় সব সেবা পেয়েছেন, আপনার সন্তান কি তা পাবে? আপনার মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কে করবে? কে আপনাকে কবরস্থ করবেন? মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কে পরিচালনা করবে? এখন সময় এসেছে ভেবে দেখার। আসুন আমরা সচেতন হই। নতুন সৃষ্টিকাজে সৃষ্টিকর্তার সাথে সহায়তা করি॥

শরতের শিউলি ফুল

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

কবি লিখেছেন, শুভ্র শিউলি ফুলের গন্ধে/ মন ভরে যায় মহানন্দে/ আকাশ বুকে মেঘের ভেলা/ ফুলের বুকে রঙের খেলা/ শরতের ওই নীল আকাশে/ তুলোর মত মেঘ ভাসে/ পূজোর গন্ধ বাতাসজুড়ে/ শিউলিতলায় ফুল যে ঝরে....। আষাঢ় শ্রাবণের টানা বর্ষণের পর মেঘমুক্ত আকাশের অবারিত নীলে ঝিলমিল শরতের দিনলিপি। যার সৌরভ ছাড়া অপূর্ণ থাকে শরতের আলপনা আঁকা সে আর কিছুই নয়, শুভ্র শিউলি। শিউলি ফুল শরতকালের অন্যতম অনুষঙ্গ। প্রকৃতির অনন্য উপহার। শিউলি ছাড়া শরৎকাল যেমন নিষ্প্রাণ, তেমনি শারদীয় উৎসবও অনেকটাই অসম্পূর্ণ। মিষ্টি শিশিরের পরশ, ঢাকের শব্দ আর ভোরের শিউলি তলা এসবই একে অন্যের পরিপূরক। কমলা রঙের নলাকার বোঁটায় সাদা পাঁপড়ির চোখ জুড়ানো স্নিগ্ধ রূপ। যা খুব সহজে মনে প্রশান্তি এনে দেয়। শিউলি ফুল শুধু সৌন্দর্যে আদরণীয় নয় সৌরভেও মনোমুগ্ধকর। কবি বলেছেন, এসো শারদ প্রাতের পথিক এসো শিউলি বিছানো পথে...। হ্যাঁ, এখন শিউলি বিছানো পথ। গাছ ভর্তি প্রিয় ফুল। হাল্কা পাতলা গড়ন। এইটুকু দেখতে কিন্তু এর আশ্চর্য মিষ্টি ঘ্রাণ! এই শরতে কত শত ফুল ফুটে আছে। তবে শিউলি সত্যি কোন তুলনা হয় না। সৌন্দর্য প্রেমীদের ফুলটি দারুণ আকৃষ্ট করে রেখেছে। একে বলা হয় স্বর্গের শোভা। এই সুগন্ধি ফুল রাতে ফোঁটে আর সূর্যের স্পর্শ পাওয়া মাত্র অশ্রু বিন্দুর মতো ঝড়ে পড়ে।

শিউলি ফুলের ছয়টি শুভ্রসাদা পাঁপড়ি। বৃন্তটি দেখতে কমলা রঙের টিউবের মতো। গাছ সাদা মাটা ধরনের নরম ধূসর ছাল বিশিষ্ট। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী দ্বিজেন শর্মা জানান, গাছ ১০ মিটারের মতো উচুঁ হয়। গাছের পাতা ৬ থেকে ৭ সেন্টিমিটার লম্বা ও সমান্তরাল প্রান্তের বিপরীত মুখী সাজানো থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যান্ড থেকে শুরু করে ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে শিউলি ফুটে। শুধু তাই নয়, এটি পশ্চিমবঙ্গ ও থাইল্যান্ডের কাঞ্চনাবুরি প্রদেশের রাষ্টীয় ফুল। বাংলাদেশের গ্রাম শহর সবখানেই আছে শিউলি গাছ। সবুজ ঘাসের ওপর ছড়ানো-ছিটানো অজস্র শুভ্র সাদা শিউলি ফুল যেন গড়াগড়ি খাচ্ছে। শিউলির আরেক নাম শেফালি। রাতে ফুটে সকাল না হতেই ঝরে পড়ে বলে এই ফুলকে বলে 'নাইট জেসমিন'। এছাড়াও আরেকটি নাম রয়েছে পারিজাত। বলা হয় শিউলি স্বর্গের ফুল। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে অনেকবার এসেছে শিউলি ফুল বা পারিজাতের কথা। কৃষ্ণের দুই স্ত্রী সত্যভামা ও রুক্মিণীর খুব ইচ্ছা তাদের বাগানেও পারিজাতের ঘ্রাণে আমোদিত হোক। কিন্তু পারিজাত তো স্বর্গের শোভা! তবুও কৃষ্ণ স্ত্রীদের খুশি করতে চান। তাই লুকিয়ে স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ থেকে একটি ডাল ভেঙ্গে এনে সত্যভামার বাগানে রোপন করেন। যার ফুল রুক্মিণীর বাগানেও ঝড়ে পরে সুগন্ধ ছড়ায়। এদিকে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তো ঘটনাটা জেনে খুব রেগে যান। তিনি বিষ্ণু অবতারের উপর গোপনে ক্রুদ্ধ ছিলেন। এই কারণে তিনি কৃষ্ণকে শাপ দেন কৃষ্ণের বাগানের পারিজাত বৃক্ষ ফুল দেবে ঠিকই কিন্তু কোনদিন ফল হবে না। তার বীজে নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে না। শাপসত্য হয়েছিল। ফল হয় না শিউলির। শিউলি ফুল হয়ে আছে এবং বলাই বাহুল্য বেশ আছে!

অন্যদিকে পৌরাণিক কাহিনী মতে শিউলি বেদনার প্রতীক। ব্যর্থ প্রেমের আলেখ্য। গল্পটা এক রাজকন্যার। সবাই তার রূপে মুগ্ধ কিন্তু সে মুগ্ধ সূর্যের প্রেমে। রাজকন্যা ভালোবেসে ছিলেন সূর্যকে। কিন্তু ব্যর্থ হল তার প্রেম। প্রবঞ্চিত রাজকন্যা হলেন আত্মঘাতী। তার চিতাভস্ম থেকে জন্মাল একটি গাছ। সেই গাছে ফুল ফুটল। তাই সকাল বেলায় যেন সূর্যের মুখ না দেখতে হয়, তার জন্য সূর্য উঠার আগেই শিউলি ফুল ঝরে পড়ে। রাজকন্যার নাম ছিল পারিজাতিকা। এই জন্য শিউলির আরেক নাম পারিজাত। শিউলির বৈজ্ঞানিক নাম 'নিক্টান্থেস আরবর-ট্রিসটিস' (Nyctanthes arbor-tristis) নামটিকে ভাঙলেও বেদনার সুর বেজে ওঠে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী দ্বিজেন শর্মা জানান, লাতিন শব্দ 'নিক্টান্থেস' (Nyctanthes) অর্থ সন্ধ্যায় ফোঁটা। 'আরবর-ট্রিসটিম' (arbor-tristis) হচ্ছে বিষন্ন গাছ। চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য নিয়ে সন্ধ্যায় ফোঁটা এবং সকাল হতেই ঝড়ে যায় বলে এমন নামকরণ। একই কারণে শিউলিকে বলা হয় 'ট্রি অব সরো'।

পূজোয় শিউলিই এমন ফুল যেটি মাটিতে ঝরে পড়লেও তাকে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা যায়। প্রাচীনকালে এ ফুলের বোঁটার রং পায়েস ও বিভিন্ন মিষ্টান্নে ব্যবহার করা হত। তাছাড়া শিউলির মালা খোঁপায় সৌন্দর্য বাড়াতেও অনন্য। তবে শুধু খোঁপায় মালা হয়ে থাকা নয়, শিউলির আছে কিছু গুণাগুণও। শিউলির পাতা ও বাকল বিভিন্ন রোগের মহৌষধ। ঔষধি হিসেবে ব্যবহার হয় শিউলির বীজ, পাতা ও ফুল। এই ফুলের বোঁটা শুকিয়ে গুঁড়ো করে পাউডার বানিয়ে হাল্কা গরম পানিতে মেশালে চমৎকার রঙ হয়। এছাড়াও অনেক কবি-সাহিত্যিক শিউলি ফুল নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। মহাকবি কালিদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নজরুল লিখেছিলেন, শিউলি তলায় ভোর বেলায় কুসুম কুড়ায় পল্লী-বালা। শেফালি ফুলকে ঝড়ে পড়ে মুখে খোঁপাতে চিবুকে আবেশ-উতলা.....। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মুগ্ধ হয়েছিলেন শিউলি ফুলের রূপে। তাঁর গান ও কবিতায় নানাভাবে, নানা প্রসঙ্গে শিউলির কথা উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন, শিউলি ফুল, শিউলি ফুল, কেমন ভুল, এমন ভুল। রাতের বায় কোন মায়ায় নিল হায় বনছায়ায়, ভোরবেলায় বারে বারেই ফিরিবারে হলি ব্যাকুল। কেন রে তুই উন্মনা।

শিউলি ফুলের আয়ু সীমিত সময়ের। রাতে ফোঁটে সুগন্ধ ছড়িয়ে সকালেই ঝরে যায়। এই কারণেই একে রাতের রাণী বলা হয়। কিন্তু আবহমান কাল ধরে চিরচেনা শিউলি ফুল সেই পৌরাণিক কাহিনী আর রূপ সৌন্দর্যের কত গান কাব্য সাহিত্য রচনা হয়েছে। আসলেই শরৎ মানেই শিউলি আর শিউলি মানেই শরৎ। উজ্জ্বল কমলা বৃন্তের ওপর সাজানো তুষার শুভ্র পাঁপড়ির চোখ জুড়ানো স্নিগ্ধ রূপ আর মনে প্রশান্তি আনা সৌরভে শিউলি ফুল কেবল প্রিয়ই নয়, আদরণীয় হয়ে আছে শিশির ভেজা ঘাসে।

তথ্যসূত্র

১. https://www.prothomalo.com

২.https://www.womennews24.com.

একজন উত্তম পালক ও মিশনারী ফাদার ল্যারী

পল লিটন গমেজ

ফাদার ল্যারী এমএম ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুইতাল মিশনে পাল পুরোহিত হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তার পালকীয় দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সদা হাস্যোজ্জ্বল ফাদার ল্যারী ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও সেবাপরায়ন। ফাদার ল্যারীর জীবন সবার নিকট ছিল আদর্শ স্বরূপ। সবার কাছেই একজন পবিত্র যাজক হিসেবে পরিচিত ছিল। তুইতাল ধর্মপল্লীর দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি একজন দক্ষ পালক রূপে ধর্মপল্লীর পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষভাবে ২য় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষার আলোকে ধর্মপল্লীকে, বিভিন্নজনকে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় পাঠায়। যুবক যুবতিদের গঠনেও মনোযোগী হন। সেবক দল গঠন করেন, রোগীদের জন্য আধ্যাত্মিক যত্ন নেন, যারা অসহায় তাদের প্রতিও উদারতা প্রকাশ করেন। বান্দুরা সেমিনারীতেও নিয়মিত যেতেন ছেলেদের পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত প্রদানের জন্য। ধর্মপল্লীর সবার নিকটস্থ একজন নমস্য পালকরূপে গ্রহণীয় হয়। প্রতি শুক্রবার তিনি পায়ে হেঁটে এবং বর্ষাকালে নৌকা করে সোনাবাজু যেতেন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে। ১৯৮৮ বন্যার সময় শত প্রতিকূলতার মাঝেও বন্যা প্লাবিত গির্জা ঘর ছেড়ে কোথাও যাননি এবং নিরলস ভাবে পালকীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। ঝড়-বৃষ্টি, শারীরিক অসুস্থতা সব কিছু তুচ্ছ করে তিনি পবিত্র সাক্রামেন্ত প্রদানের জন্য নিয়মিত রোগী বাড়ী যেতেন।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট ফাদার ল্যারী তুইতাল পবিত্র ধর্মপল্লীতে পাল পুরোহিত হিসাবে কাজ শুরু করেন। প্রথমে এসেই উপলব্ধি করলেন এই পুরাতন গির্জাটি পুনরায় একটি নতুন গির্জা তৈরী করা। তাই ফাদার ল্যারীর অনুরোধে একজন তরুন বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার তুইতাল আসেন এবং গির্জাটি পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেন-গির্জাটি খুবই দুর্বল ও বিপদজনক। তিন বছরের মধ্যে একটি নতুন গির্জা তৈরী করতে হবে। রিপোর্টের ভিত্তিতে ফাদার নতুন গির্জা তৈরীতে মাঠে নেমে পড়লেন তুইতালবাসীকে সঙ্গে নিয়ে। তুইতাল নতুন গির্জা নির্মানে তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবদানের কথা মিশনবাসীগণ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে।

ফাদার গির্জা নির্মাণ করতে বেশ কিছু কৌশল নিয়েছিলেন তা হালো:

- বাড়ী বাড়ী হতে টাকা পয়সা সংগ্রহ করা
- বড়দিনের নাটকের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা
- বাৎসরিক লটারির আয়োজন করা।

দীর্ঘ ১২ বছরের শ্রম সাধনার ফলে পবিত্র আত্মার গির্জা সম্পন্ন হয়। পিমে ফাদার এজ্জিও তিনি এই গির্জার স্থপতি। এর সাথে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ছিলেন শক্তির উৎস, উপলব্ধির উৎস, উদার সাহায্যের উৎস। সেই সাথে ফাদার ল্যারী ও ফাদারের পরিবারের উদার সাহায্যের ফলে আমাদের পবিত্র আত্মার গির্জার কাজ সম্পন্ন হয়। ফাদার ল্যারী তার শুভেচ্ছা বাণীর শেষ অধ্যায়ে বলেন, আমরা সবাই ঈশ্বরকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাই।

সত্যিকার অর্থে এই গির্জা তুইতালবাসীর। তুইতালের জনগণের একজন হতে পেরে আমি ধন্য।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে ফাদার আলবিন যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও কর্তৃক। তুইতালবাসী ও ফাদার ল্যারীর পরিচালনায় সমস্ত কিছু আন্তরিক ভাবে সম্পন্ন হয় যা ছিল ফাদার ল্যারীর প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠান। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও কর্তৃক অভিষিক্ত হন।

এখানে ফাদার ল্যারীর কিছু কর্মময় জীবনের কথা উল্লেখ করতে চাই যা তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগে ফাদার জেরাল্ড পারশা, ফাদার জেমস লরেন্স শ্যানবার্গার পড়েন তা নিম্নরূপ:

ফাদার জেমস শ্যানবার্গার এম এম ১৯২২-২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে নিউইয়র্কের মেরিনলের অ্যাসিস্টড লিভিং সেন্টারে মারা যান। তিনি ৯৮ বছর বয়সী এবং ৭১ বছর ধরে মেরীনল সম্প্রদায়ের পুরোহিত ছিলেন।

ফাদার জেমস লরেন্স শ্যানবার্গার, সাত সন্তানের মধ্যে একজন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর, মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোরে, জেমস এবং মার্গুয়েরাইট ম্যাকক্লোস্কি শ্যানবার্গারের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম ছিল অল সেন্টস্ পারোকিয়াল স্কুল, তিনি বাল্টিমোরের আর্চ ডাইয়োসিস সেমিনারে যোগদান করেন এবং ছয় বছর পর মেরিল্যান্ডের ক্যাটনসভিলে সেন্ট চার্লস কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি এক বছরের জন্য বাল্টিমোরের সেন্ট মেরির মেজর সেমিনারীতে পড়াশুনা করেছিলেন ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ মিরীনল সেমিনারীতে যোগদানের আগে। কেন হঠাৎ এই পরিবর্তন? কারণ এক সন্ধ্যায়, বিশপ জেমস এডওয়ার্ড ওয়াশকে বাল্টিমোরের সালপিশিয়ান পুরোহিতের দ্বারা পরিচালিত সেন্ট চার্লস কলেজের কলেজ ছাত্রদের সাথে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যখন তিনি ট্রেন থেকে নামছিলেন সেখানে একজন সালপিশিয়ান পুরোহিত জেমস এডওয়ার্ড ওয়ালশকে ডাইওসিস সেমিনারে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, বিশপ জেমস এডওয়ার্ড ওয়ালশ একজন দরিদ্র বৃদ্ধকে দেখলেন একটি বেঞ্চের উপর শুয়ে আছে, ঠান্ডায় কাঁপছে, এ দেখে বিশপ তাৎক্ষণিকভাবে সালেসিয়ান পুরোহিতের সাথে না গিয়ে বরং বৃদ্ধের পাশে গেলেন। তিনি তার ঠান্ডা হাতটি ধরলেন আলতো করে, তার সাথে কথা বললেন এবং তাকে আশীর্বাদ করলেন। বিশপ ওয়ালশ তার নিজের শীতের কোট খুলে বৃদ্ধর শরীরে জড়িয়ে ধরলেন, তার হাতে চুম্বন করলেন এবং তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বিশপ ওয়ালশ অপেক্ষারত সালপিশিয়ান পুরোহিতের কাছে ফিরে গেলেন যিনি সমস্ত ঘটনার সাক্ষী ছিলেন।

তারা যখন সেমিনারে এসে অপেক্ষারত ছাত্র এবং পুরোহিতের কাছে উপস্থিত হলেন, বিশপ ওয়ালশ মিশন জীবন এবং ঈশ্বরের বিস্ময়কর আশীর্বাদ সম্পর্কে ত্রিশ মিনিটের একটি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শেষে সালপিশিয়ান পুরোহিত (Sulpician Priests) ট্রেন স্টেশনে যা ঘটেছিল তার চারপাশে গল্পটি ছড়িয়ে গেল। বিশপের আলোচনা এবং সংবাদ শুনে, জেমস লরেন্স শ্যানবার্গার সিদ্ধান্ত নিলেন মেরীনল-এ যোগ দেওয়ার জন্য। ফাদার জেমস লরেন্স শ্যানবার্গার, মেরীনল-এ ১১ জুন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন।

অভিষেকের পরে ফাদার শ্যানবার্গারকে আরও পড়াশোনার জন্য সুযোগ দেওয়া হয় এবং নিউইয়র্কের ম্যানহাটন কলেজের রসায়নে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং তারপরে নিউ জার্সির লেকউডের মেরীনল কলেজের অনুষদে নিযুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তাকে চিলির মেরীনলের মিশন অঞ্চলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তার দায়িত্ব ছিল কৃষি বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা এবং যেখানে চিলির তরুণ কৃষকরা প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলেন। আট বছর পরে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তাকে তালকাহুয়ানোর লা আসুনসিওন প্যারিশে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল,

যা চিলির ইস্পাত কর্মীদের এবং তাদের পরিবারের সেবা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৎকালীন ভেনিজুয়েলা মিশন ইউনিটে মেরীনলদের সুপিরিয়র নিযুক্ত হন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জুনেতিনি ভেনিজুয়েলা কলম্বিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক সুপিরিয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পদাধিকার বলে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে ষষ্ঠ জেনারেল অধ্যায়ের ডেলিগেট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফাদার শ্যানবার্গার নিউইয়র্কের মেরীনল মেজর সেমিনারীর রেক্টর ছিলেন। এই সময়ে তিনি নেব্রাস্কা ওমাহার ক্রেইঁন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খ্রিস্টান আধ্যাত্মিকতায় (Christian Spirituality) মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

অক্টোবর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ৫৭ বছর বয়সে, ফাদার শ্যানবার্গার তার নিজের ইচ্ছায় মেরীনল বাংলাদেশ ইউনিটে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং একবারে আলাদা মিশন শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য জন্য ভিসা পেতে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে তিনি ভারতের কলকাতায় কাটিয়েছেন, মাদার তেরেসা এবং তার মিশনারী সিস্টারস এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ব্রাদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন এবং কঠিন বাংলা ভাষাও অধ্যয়ন করেছিলেন। অবশেষে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ফাদার শ্যানবার্গার বাংলাদেশে তার কাজ শুরু করতে সক্ষম হন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকে জানুয়ারি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের পর্যন্ত তিনি তুইতাল পবিত্র আত্মা ধর্মপল্লীতে পুরোহিত ছিলেন, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছেল, তখন ফাদার তার তুইতাল ধর্মপল্লীতে অবস্থান করছিলেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বন্যায় তার রেক্টরি ও গির্জায় বেশ কয়েক ফুট জল ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি অন্যত্র চলে যাননি।

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে হয়। হাসপাতালে বেশ কিছু দিন থাকার পর তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। তবে চিকিৎসকরা তাকে মিশনারী জীবনের কঠোরতায় ফিরে না আসতে সতর্ক করেছিলেন।

পরে তার অনুরোধে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে তাকে আন্দিয়ান অঞ্চলে চিলির একটি গির্জায় নিয়োগ দেওয়া হয় যা সান্টিয়াগোয়ের নিকটে একটি বড় ধর্মপল্লী, নাম "আওয়ার লেডি অফ মার্সি" "Our Lady of Mercy"। চিলির নগরে চ্যালেঞ্জ গুলো ছিল- বেকারত্ব, সহিংসতা, মাদক, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা, বেকারত্ব, পর্নোগ্রাফি।

ফাদার শ্যানবার্গার উল্লেখ করেছিলেন যে তার মিশন জীবনে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো অত্যন্ত দরিদ্র ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের সেবার জন্য তাদের প্রচেষ্টায় কলকাতার মাদার তেরেসা এবং তার সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করার আশীর্বাদ রয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশের কাথলিক পরিবারগুলির সেবা করার এবং তাদের প্রতিবেশী মুসলিম এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিতে এবং শ্রদ্ধার সাথে বসবাস করার পারস্পরিক প্রচেষ্টা এবং আকাঙ্ক্ষার সাক্ষী হওয়ার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় চিলি চার্চের সাথে সহযোগিতা করার পাশাপাশি তিনি চিলির সংস্কৃতি, চিলির পুরোহিতদের মূল্যবোধ ও অগ্রাধিকার এবং তাদের বোঝার গভীরতা উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন।

ফাদার শ্যানবার্গার ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন এবং অবসরকারীন মেরীনল সম্প্রদায়ের সদস্যদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব পান। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে, তিনি সেন্ট তেরেসার প্রার্থনার অংশীদারদের দলে নিযুক্ত হন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ফাদার শ্যানবার্গার তার ৭০ তম জয়ন্তী পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে মেরীনল পুরোহিত হিসেবে উদ্‌যাপন করেছিলেন।

২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে সকাল ১১ টায় Queen of Apostles Chapel-র সমাধি খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার রেমন্ড ফিন্স ছিলেন প্রিন্সিপাল সেলিব্রেট এবং হোমিলিস্ট (Father Raymond Finch was Principal Celebrant and Homilist) ফাদার জেরাল্ড পারশা জীবনীটি পড়েন এবং ফাদার জন সুলিভান শপথটি পড়েন। মেরীনল সোসাইটির কবরস্থানে ফাদার শ্যানবার্গারকে চির সমাহিত করা হয়॥

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, ডাকঘর : রাঙ্গামাটিয়া, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
স্থাপিত : ১ জানুয়ারী, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি: নং-৩২৭/১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ
মোবাইল: ০১৭১৪৩১৪৪১৪/০১৭৩৯৪৯২১১৮, E-Mail: rcccu.ltd@gmail.com

৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নতুন ভবন উদ্বোধনীর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড" এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আগামী ২২ অক্টোবর'২০২১ খ্রিস্টাব্দ **"রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড"** এর নতুন অফিস ভবন উদ্বোধন ও সমিতির ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতির নিজস্ব অফিস ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

স্থান	**:**	**আগ্নেশ ভবন (সমিতির নিজস্ব কার্যালয়) রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।**
তারিখ	**:**	**২২ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার**
সময়	**:**	**সকাল ১০ টা ৩১ মিনিট**

বার্ষিক সাধারণ সভার বিস্তারিত আলোচ্যসূচী যথাসময়ে সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হবে।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: **(১) সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার বকেয়া/ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য কোন ভাবেই সাধারন সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।**

ধন্যবাদান্তে,

রনেল গমেজ
সেক্রেটারী
রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।

বিজ্ঞ/২৫৯/২১

মুশুরীখোলা ও কিছু খ্রিস্টীয় আদি ভূমি এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ

ড. ইসিদোর গমেজ

পূর্ব প্রকাশের পর

বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর সঠিক ইতিহাস রচনা করতে হলে এদেশে প্রটেস্ট্যান্ট তথা ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর সূচনা ও বিকাশের ঘটনা প্রবাহ জানা আবশ্যক। এদেশে খ্রিস্টবাণী প্রচারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে তারা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারে অগ্রগামী ছিল। "১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড ওয়েন লেনার্ড ঢাকায় আসিয়া হিন্দুদের জন্য ৫টি, মুসলমানদের জন্য ১টি, এবং খ্রিস্টীয়ানদের জন্য ১টি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনিই ঢাকায় আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। রেভারেন্ড লেনার্ডের প্রতিষ্ঠিত যে সকল স্কুলে বাংলা ভাষায় খ্রিস্টীয় ধর্ম শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত, সে সকলের জন্য দেশীয় ভদ্রলোক ও ইউরোপিয়ানগণ অর্থ সাহায্য করিতেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা অঞ্চলে ১৫ টি স্কুলে ১৩০০ ছাত্র পড়িতেছিল। বালিকাদের জন্যও তিনি ৪টি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। রেভারেন্ড লেনার্ডের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঢাকা শহরে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে একটি ইউরোপীয় ও একটি দেশীয় মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১২,০০০ সুসমাচার-খণ্ড এবং ২৫,০০০ ট্র্যাক্ট (লিফলেট) বিতরণ করা হইয়াছিল।"

বিভিন্ন সূত্র ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে অনুমিত হয় যে, কাথলিক খ্রিস্টান অধ্যুষিত অনেক গ্রামে পরবর্তীতে প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলী তাদের কার্যক্রম শুরু করে। আবার কালের আবর্তে সেগুলো খ্রিস্টান শূন্য হয়ে পড়ে। আমাদের চোখের সামনে এরকম জলজ্যান্ত উদাহরণ আছে। একাধিক গ্রন্থে দোম আন্তনীওর খ্রিস্টানদের গ্রামের নামের উল্লেখ আছে। যেগুলোর বেশীর ভাগই এখন অন্য নাম ধারন করেছে অথবা শুরুতেই বিকৃত করে লেখা হয়েছে। জেমস রেনেল-এর মানচিত্রে উল্লিখিত নামগুলো পর্যালোচনা করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। এ প্রসঙ্গে কিছু গ্রামের পূর্বের ও বর্তমান নাম উল্লেখ করা হলো:

পূর্ব নাম	বর্তমান
সামভার	সাভার
হসারাৎপুর	হজরতপুর
সামপুর	শ্যামপুর
বাগুরতা	ভাকুর্তা
করাতিয়া/বলাতিয়া	কলাতিয়া
মুনশী খোলা/মুসকোল	মুশুরীখোলা
গোয়ালা	গোল্লা
তালিমপুর	গালিমপুর
গাট্টা	গুইটা
দেতল্লা	দেওতলা
হোসনাবাদ	হাসনাবাদ
ইপ্রাসি/ইগ্রাসি	ইকরাশী
বারোখালি	বাড়িখালি
সেখনগর	শেখরনগর
চুরান	চূরাইন
বেনুখাল	বেনুখালী
চরচারয়া	চরচরিয়া/দাশপাড়া
গোবিনপুর	গোবিন্দপুর
বারার	বাররা
কির্দ্দাপুর	কার্তিকপুর
জামোরা	জামুর
জমিতার	জামির্তা

আবার দেখা যায় যে, কোন কোন জায়গার নাম শত শত বছর ধরে অপরিবর্তিত আছে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের প্রাচীন খ্রিস্টান জনপদের অবস্থান নির্ণয় করা তেমন কঠিন কাজ নয়। কোন কোন জনপদ নদী ভাঙ্গুনীতে বিলীন হয়ে গেলেও পুনরায় জেগে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পদ্মায় ভেঙ্গে যাওয়া মালিকান্দা, নারিশা ও নাগেরকান্দা এলাকায় খ্রিস্টানদের অনেক জমিতে এখন আবার জনবসতি গড়ে উঠেছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, একসময় প্রমত্তা পদ্মার ভাঙ্গুনীতে নাগেরকান্দা গ্রামের দক্ষিণাংশ বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সুসজ্জিত নাগেরকান্দা গ্রামের মানুষ ভিটা-মাটি ছেড়ে হাসনাবাদ, ইকরাশী, তুইতালের দিকে সরে এসেছিল, কোন কোন পরিবার বাংলা-পূর্ববালা ছেড়ে একেবারে ভারতে পাড়ি দিয়েছিল। এটা বেশী দিন আগের কথা নয়। ফাদার শিমন প্যাট্রিক গমেজ-এর পরিবারও নাগেরকান্দা থেকে ইকরাশী এসে বাড়ী করেছে। প্রমত্তা পদ্মা নাগেরকান্দা গ্রামের দক্ষিণাংশ গ্রাস করে এবং ফাদার শিমনদের বাড়ী ঘেঁষে বইতে থাকে। ধরতে গেলে তাদের বাড়ীর ঘাটেই বড় বড় নৌকা, এমন কি জাহাজও নাকি ভিড়ত। সেটি ছিল মাত্র ৮০/৯০ বছর আগের কথা। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল, ঊনিশ শ' ষাটের দশকে নাগেরকান্দার দক্ষিণে আবার চর পড়তে শুরু করল এবং ২০/২৫ বছরের মধ্যে সেই চরে ফসলের চাষ ও মানুষের ঘর-বাড়ী নির্মিত হলো। বর্তমানে নাগেরকান্দার দক্ষিণে সাহেবের চর বা পাদ্রির চরসহ দুই তিনটি গ্রাম, তারও দক্ষিণে পদ্মা। স্থানীয় জনগণের কাছে জানা গেছে, ঐ সাহেবের চর এলাকায় খ্রিস্টানদের রেকর্ডভুক্ত ও চার্চের অনেক জমি আছে।

আমি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বই পড়ে ও গুগল ম্যাপ-এর সাহায্য নিয়ে আমাদের খ্রিস্টান অধ্যুষিত প্রাচীন গ্রামগুলোর অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। ভূষণা রাজ্যের কোন স্থানে ছিল দোম আন্তনিওর ধর্মনগর, তেলিহাটি, কোষা ভাঙ্গা, লড়িকুল, চন্ডীপুর গ্রামগুলো। ধর্মনগর নামে কোন স্থানের খোঁজ পাওয়া না গেলেও তেলিহাটি গ্রামের সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রামটি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় অবস্থিত নাড়িকেলবাড়ি কাথলিক মিশনের কাছেই। কোষাভাঙ্গা-ই হয়তো কালের বিবর্তনে শুধু ভাঙ্গা বা ভাঙ্গার হাট হয়ে গেছে। ওদিকে লড়িকুল ও চন্ডীপুর বর্তমানে পদ্মায় নিমজ্জিত হলেও তাদের অবস্থান ছিল বর্তমান শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় সীমানার মধ্যে। মাত্র কয়েক বছর আগে চন্ডীপুর গ্রাম পদ্মার ভাঙ্গনে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। এই চন্ডীপুর গ্রামেই নাকি ১৬৫০/১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে দুই হাজার কাথলিকের বসবাস ছিল। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, উল্লিখিত খ্রিস্টান গ্রামগুলো ৫/৬ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে ছিল। আর এসব এলাকা থেকে আঠারগ্রাম মানুষদের পূর্বপুরুষদের এলাকা ছিল পদ্মা নদীর এপাড় ওপাড়, মাত্র ৭/৮ মাইল দূরত্বে।

আরও একটি বিষয় আমি উপলব্ধি করেছি সেটি হলো, আঠারগ্রামের বাড়ির নামের সাথে তাদের মাইগ্রেশনের উৎসস্থলের একটি ইঙ্গিত/সূত্র এখনও পাওয়া যায়। যেমন, ইকরাশী গ্রামের আম্ব্রাবাজ বাড়ীর পূর্বপুরুষ/লোকজন জানে তারা পদ্মার ওপারে আমরাবাদ (আমিরাবাদ) থেকে এসেছেন। সেজন্য তাদের বাড়ীর নাম, আম্ব্রাবাজ বাড়ী। রেনেলের ম্যাপে আমিরাবাদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান আছে। একইভাবে, আমার ধারনা, বালিডিওর গ্রামের মুন্সিবাড়ির পূর্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ ঢাকার নিকটবর্তী মুন্সিখোলা (মুশুরীখোলা) থেকে মাইগ্রেট করেছেন।

উপসংহারে, আমার প্রত্যাশা, বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিদ, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক, অর্থনৈতিক সংস্থা এবং আগ্রহী ব্যক্তিগণ আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের উপাত্ত ও ধারাবাহিক বিকাশের বিস্তারিত ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হবেন। এ কাজটি করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন এবং গবেষণার জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা থেকে স্কলারশিপ বা ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন কাজ নয়।

তথ্যসূত্র:

১. **আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস**- ড. তপন বাগচী সম্পাদিত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯০৮ ও ১৯২২ খ্রি:)।

২. **ঢাকার ইতিহাস**- যতীন্দ্রমোহন রায়। প্রথম সংস্করণ- ১৩১৯; দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পুনঃমুদ্রণ-জানুয়ারী ২০০০।

৩. **মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস**- সম্পাদনা: মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক; প্রথম প্রকাশ: ২৯ এপ্রিল ১৯৮৭।

৪. **বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী**- যেরোম ডি' কস্তা; প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৮ (প্রথম খন্ড)

৫. **বঙ্গে খ্রীষ্ট-মন্ডলী**- শ্রী মথুরানাথ নাথ (রচনা কাল- ১৮৯২; প্রকাশক বাংলাদেশ ব্যাপ্তিষ্ট সংঘ, ১৯৮৪ খ্রি:)।

৬. **বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস**- প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত (১৯৮৫ খ্রি:)।

৭. **বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়**- লুইস প্রভাত সরকার (আগষ্ট ২০০২ খ্রি:)।

৮. **তিনশো বছর আগে**- জুলিয়ান এ. গোমেজ (১৯৬৬ খ্রি:);

৯. **ইতিহাসে উপেক্ষিত**- ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়; প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯১; দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ॥ (সমাপ্ত)

রাগের জন্যই এসব

খেলতে খেলতে একসময় ট্রেভর ও জেসনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধে। শরীরের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তারা একে অপরকে কিল ঘুষি মারে। তাদের ঝগড়া দেখে দূর থেকে এক বৃদ্ধ দৌড়ে এসে ধমকের সুরে বলল, "বন্ধ কর তোমাদের ঝগড়া, আর কখনও এভাবে ঝগড়া করবো না।" ট্রেভর ও জেসন ঝগড়া থামিয়ে বৃদ্ধ বার্ণির দিকে তাকায়। বন্ধুর মতো দু'জনকে দু'বাহুতে আঁকড়ে ধরে তাদের দিকে সে মাথা নিচু করে দেখে। এতে ট্রেভর ও জেসন আর ঝগড়া করতে পারে না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে পরস্পরের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। বৃদ্ধ বার্ণি বললো, "চলো আমরা নৌকায় কিছুক্ষণ বসি; আমি তোমাদের জন্য একটি গল্প বলবো।" ট্রেভর ও জেসন বিনয়ের সহিত বৃদ্ধ বার্ণির দু'পাশে হাঁটে। কিছু দূর হেঁটে তিনজনেই একটি নৌকার উল্টোপিটে বসলো।

বৃদ্ধ বার্ণি গল্প বলা আরম্ভ করলো, "তোমাদের মতো ছোট থাকতে বড় ভাই ও আমি প্রায়ই চাকা-গাড়ি খেলতাম। জেসন জিজ্ঞেস করলো, "চাকা-গাড়িটা কি জিনিস?" বৃদ্ধ বার্ণি বলল, "এটি সাধারণত লোহা টুকরোর ১.৩ মিটার দিয়ে গোলাকারভাবে বানানো হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভাঙ্গা চালুনির গোলাকার অংশটি বা কাঠ দিয়ে গোলাকার করে বানিয়ে চাকা-গাড়ি হিসেবে খেলে থাকে। আর বড় ছেলেরা লোহার বানানো চাকা-গাড়ি বেশি খেলা করে। ছোট একটি শিক বা লোহা বেকিয়ে ব্রেক বানিয়ে তারা এই ধরণের গাড়ি চালায়।"

একদিন বড় ভাই ও আমি চাকা-গাড়ি খেলছিলাম। বাঁশ দিয়ে তৈরি গাড়িটা আমি খেলছিলাম। বড় ভাই খেলছিলেন লোহার গাড়িটা দিয়ে। তার গাড়িটা চালিয়ে দেখার জন্য আমি চাইলাম। কিন্তু সে আমাকে চালাতে দিলো না তো দিলোই না বরং বলল, "আমি নিজেই ভাল মতো চালাতে পারছি না আর তুমি তো ছোট মানুষ আরও চালাতে পারবে না।" "চালাতে পারবো দাদা, একবার শুধু আমাকে সুযোগ দাও। আমি তোমাকে দেখাবোনে কিভাবে চালাতে হয়।" "না, আমি কোনো মতেই তোমাকে দিতে পারবো না।" রাগ করে আমি বড় ভাই এর বুকে একটা ঘুষি মারি। সেও আমার মাথায় একটা ঘুষি দেয়। এভাবে আমাদের দু'জনের মধ্যে ঝগড়া চলে। একপর্যায়ে বড় ভাই আমাকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে আমি একটি পাথরের উপরে পড়ে হাতে আঘাত পাই। ব্যথা যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদি। বড় ভাই আমাকে উঠাতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যথায় আমি উঠতে পারছিলাম না। বড় ভাই ভয়ে অনুতপ্ত হয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বার বার স্যরি ভাই স্যরি বলে আমাকে সমবেদনা জানায়।

আমার এ করুণ অবস্থা দেখে একজন পথযাত্রী দৌড়ে আমার নিকটে আসেন, যে নাকি প্রাথমিক চিকিৎসা জানতেন। সে আমাকে তার কোলে করে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং মাকে বলে তোমার ছেলের হাত, ভেঙ্গে গেছে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে এখনি। এই কথা শুনে আমি প্রচুর কান্না করি। মাও অনেক মন খারাপ করে। তারা ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে যায়। ডাক্তার আমার জামা হাতা কেটে ভাঙ্গা হাতটি দেখে বলল, "খোকা কেঁদো না, ভাল হয়ে যাবে"। এক্সরে করলে জানতে পারলাম আমার হাতের কব্জি একটু নড়ে গেছে আর দু'টি হাড় ভেঙ্গেছে। ডাক্তার আমার হাতটি প্লাস্টার করে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'বার অস্ত্রোপচার করার পরও আমার ভাঙ্গা হাতটি আর সোজা হলো না। এই যে দেখ আমার বাম হাত ১৩ সেন্টিমিটার ডান হাত থেকে বেঁকে আছে। বৃদ্ধ বার্ণির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ট্রেভর বলল, "দাদু, তোমার ভাঙ্গা হাতের জন্য আমার কষ্ট লাগছে। তোমার ভাঙ্গা হাতের করুণ কাহিনী বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ।" বার্ণি বলল, "হ্যাঁ, সত্যি অনেক বছর আগে আমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়ার কারণেই আমার বাম হাতটি এখন পর্যন্ত বেঁকে আছে।"

জেসন বলল, "তাহলে তুমি এর জন্যই আমাদের ঝগড়া থামিয়ে ছিলে তাই না, দাদু?" তুমি ঠিকই বলেছ দাদু, আসলে কি জানো দাদুরা, যখনই আমি দেখি কোনো ছেলেমেয়েরা ঝগড়া করছে; তখন আমার ভয় লাগে তারাও হয়তো আমার মত আঘাত পাবে। সারাজীবন কষ্ট পাবে। তাই এর জন্য ঝগড়া করা দেখলে আমি থামিয়ে দেই। তোমাদেরকেও আজকে থামালাম। দাদুরা আজ থেকে সবসময়ই মনে রাখবে রেগে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়; কখনোই ঝগড়া করতে নেই। কারণ এতে ভাল ফল আসে না। তোমারাই এখন বিচার বিশ্লেষণ কর ঝগড়া করা ভাল কাজ কি-না।

বৃদ্ধ বার্ণির কথাই ঠিক। রেগে গেলে আমাদের ঝগড়া করতে নেই। কারণ তর্কে জড়িয়ে রেগে ঝগড়া করা কোনো সময়ই মানুষের জীবনে মঙ্গলকর কিছু বয়ে আনতে পারে না॥

মূলঃ আংকেল আর্থার
ভাষান্তরঃ মানুয়েল চাম্বুগং

শিশুরা ফুলের মতো

সিস্টার সম্পা গমেজ সিআইসি

বস্তিঘরে স্বস্তিহারা ছোট একটি বাবু
এই দুনিয়ায় মানুষ হয়ে জন্ম নিল
ফুলের মতো শিশু।

সহজ সরল হৃদয় তোমার
ফুলের মতো মায়াময় স্নিগ্ধ হাসি
হৃদয়কুঞ্জে যেন রয়েছে
মধু-জড়ানো অমৃত হাসি
ঠিক যেন মনে হয়
পূর্ণিমার শশী।

আজকে তুমি শিশু
ভবিষ্যতে হবে দেশের কর্ণধার
তাই শিক্ষাকে আপন করে নাও
একদিন হবে তুমি নেতা সবার।

তাই আজ এই হতভাগা শিশুদের
বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলতে হবে
সব শিশুরাই ফুলের মত সুন্দর ও পবিত্র।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

এক সাথে চলা (সিনডালিটি) মণ্ডলীর প্রকৃতি প্রকাশ করে

- রোমের বিশ্বাসীবর্গের প্রতি পোপ মহোদয়

রোম ডাইয়োসিসের খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের উদ্দেশে পোপ ফ্রান্সিস আসন্ন সিনড সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, সিনড হলো একটি যাত্রা যেখানে সমগ্র মণ্ডলী সম্পৃক্ত থাকে। তাই সিনডের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে; একসাথে চলা (সিনডাল) মণ্ডলীর জন্য: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে অক্টোবর

২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সিনড কার্যক্রম চলবে। সিনডের এই যাত্রাকালে পারস্পরিক শ্রবণের গতিশীলতা থাকবে, মণ্ডলীর সকল স্তরের ঐশ জনগণ জড়িত থাকবে এতে।

প্রথম পর্যায়: সিনডের প্রথম পর্যায়ের (অক্টোবর ২০২১-এপ্রিল ২০২০) কার্যক্রমের ক্ষেত্র হলো পৃথকভাবে প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশীয় মণ্ডলীগুলো। 'তাই আমি আপনাদের বিশপ হিসেবে এখানে এসেছি এ কথা সহভাগিতা করতে যে, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে রোম ডাইয়োসিস সিনডীয় এই যাত্রায় খুব প্রত্যয় নিয়ে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক সাথে চলা (সিনডালিটি) মণ্ডলীর প্রকৃতি, রূপ, স্টাইল এবং প্রেরণকর্ম প্রকাশ করে। সিনড "synod" শব্দটি প্রকৃতপক্ষে এক সাথে চলার জন্য যা দরকার তার সবকিছুকেই প্রকাশ করে।

প্রেরিতদের কার্যাবলী গ্রন্থ: প্রেরিতদের কার্যাবলী গ্রন্থটি নির্দেশ করে পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করেন মণ্ডলীতত্ত্বেও প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যানুয়াল এটি। যেখানে একটি যাত্রার বর্ণনা আছে যা শুরু হয়েছিল জেরুশালেম থেকে এবং শেষ হয়েছিল রোমে। এই পথটি সেই গল্প বলছে যে ঈশ্বরের বাণী এবং মানুষেরা একসাথে হেঁটেছে। যে মানুষেরা তাদের মনোযোগ ও বিশ্বাস ঈশ্বরের বাণীর উপর রেখেছে। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, সকলেই নায়ক বা কেউ এক্সটা নন। যা আমাদেরকে ধরে রাখে এবং একসাথে চলাফেরা বা হাঁটতে বাঁধা দেয় মাঝে মাঝে তা ছেড়ে দিতে কিংবা দিক পরিবর্তন করতে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠতে হয়। পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করেন ক্রমবর্ধমান খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষভাবে দরিদ্রদের খাদ্য সহায়তা দান সমস্যার সৃষ্টি করছে। প্রেরিতদের কার্যাবলী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই পোপ মহোদয় বলেন, এ সমস্যার সমাধান করতে হলে শিষ্যদেরকে একসাথে সমবেত করা এবং সকলে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৭ জনকে নিয়োগ করা যারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে খাদ্য সেবাদানে নিয়োজিত থাকবে।

ধর্মপ্রদেশীয় পর্যায়: সিনড কাঠামোর প্রক্রিয়ায় ফিরে এসে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, ধর্মপ্রদেশীয় পর্যায়ে সিনড খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা তা দীক্ষাপ্রাপ্ত সকলের কথা শুনে সকলেই সম্পৃক্ত করে। নেতা ও অধস্তন জনগণ, যারা শেখায় ও যারা শেখে তাদের মধ্যকার তীব্র ব্যবধান নির্ভর মণ্ডলীর ভাবমূর্তিটি জয় করতে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা অনেকেই ভুলে যায় ঈশ্বর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চান। এক সাথে হাঁটা আমাদেরকে উচুঁ-নীচু চিন্তা না এনে পাশাপাশি থাকার বোধ জাগ্রত করে।

বিশ্বাসের অনুভূতি: পোপ বলেন, বিশ্বাসের অনুভূতি যিশুখ্রিস্টের প্রাবক্তিক কাজের মর্যাদায় প্রত্যেককে যোগ্য করে তুলে; যাতে করে আমরা নির্ধারণ করতে পারি বর্তমান সময়ে মঙ্গলসমাচারের পথগুলো কী। তিনি ব্যাখা করে বলেন, বিশ্বাসের অনুভূতি কোন নির্দিষ্ট শিরোনাম, বিশ্বাসতত্ত্বের একক কোন ধারা বা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের যোগাযোগের মধ্যে বা মতামতের তুলনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু এ ধারণাও এখানে প্রাধান্য পাবেনা।

সকলের জন্য: নিজেকে ঐশ প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত মহান মানুষের অংশ অনুভব করা খুব দরকারী। এমন একটি ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত করো যা প্রস্তুতকৃত স্বর্গীয় ভোজসভায় সকলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে অপেক্ষারত। 'ঈশ্বরের জনগণ' এ ধারণাটিই কঠোরভাবে ব্যাখা করে সরিয়ে দেবার ফাঁদ তৈরি করা যেতে পারে। 'ঈশ্বরের জনগণ' হওয়া বিশেষ কোন সুযোগ নয় কিন্তু একটি উপহার। যা একজন সকলের জন্য গ্রহণ করে, আর তা হলো দায়িত্ব। সিনডের যাত্রায় বিশ্বাসের অনুভূতিতে শ্রবণ প্রবেশ করতে হবে কিন্তু তা অবশ্যই পূর্ব অনুমান উপেক্ষা করে নয়। পোপ ফ্রান্সিস বলতে থাকেন, আমি সিনডীয় প্রক্রিয়ায় এখানে আপনাদের উৎসাহ দিতে চাই কেননা আপনাদেরকে পবিত্র আত্মার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁকে শ্রবণ করুন নিজেকে শোনার মধ্যদিয়ে এবং কাউকেই ত্যাগ বা পিছনে রাখবেন না। আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন শুধু তারাই নন সমগ্র মণ্ডলীকে এ সিনড প্রক্রিয়ায় জড়িত করুন।

ওঠ, তোমাদের জীবনে যিশুর সাক্ষ্য বহন কর

- ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবসে পোপ ফ্রান্সিস

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব দিবসের প্রস্তুতিস্বরূপ ৩৬তম বিশ্ব যুব দিবস ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে ২১ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। এ উপলক্ষে পোপ মহোদয় গত ২৭ সেপ্টেম্বর তার বাণী প্রকাশ করেছেন যার প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছেন 'ওঠ, তোমাকে আমি মনোনীত করেছি যা দেখেছ তার সাক্ষী দেবার জন্য' শিষ্যচরিত গ্রন্থের ২৬ অধ্যায়ের ১৬ পদ থেকে। কোভিড-১৯ এর কারণে নিদারূণ দুর্দশা ও কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে বিশ্বব্যাপী যুবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন বাণীতে। অনেক যুবকই এ সময় পরিবারের মধ্যকার সমস্যা, বেকারত্ব, নিরাশা, একাকীত্ব ও আসক্তিগত আচরণ অভিজ্ঞতা করেছে। কিন্তু পোপ মহোদয় সুস্পষ্টভাবে বলেন, এই মহামারী যুবকদের গুণগুলো প্রকাশ করেছে বিশেভাবে সংগতি ও একাত্মতার প্রতি অনুরাগটা দৃশ্যমান হয়েছে। যখন কোন যুবকের পতন হয় তখন সমগ্র বিশ্ব পতিত হয় তেমনিভাবে একজন যুবক যখন জেগে ওঠে তখন সমগ্র বিশ্বও জেগে ওঠে। এ কথা বলে পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বের যুবকদের বলেন, বিশ্বকে নবীন ও সতেজ করতে আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে জেগে ওঠা॥

- তথ্যসূত্র: *news.va*

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফ বর্ষে সুলেখিকা সিস্টার মেরী প্রশান্ত এসএমআরএ **'যোসেফের নিকটে যাও'** গ্রন্থটি সকলের জন্য উপহার হিসেবে এনেছেন।

সাধু যোসেফের ন্যায় পবিত্র পরিবার গঠন করে প্রতিটি পরিবার সুখী ও আনন্দময় জীবন-যাপন করুক।

বইটির প্রাপ্তিস্থান: প্রতিবেশীর সকল বিক্রয় কেন্দ্র ও মেরী হাউজ

১। প্রতিবেশী প্রকাশনী
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৩৮৮৫

২। তেজগাঁও শাখা
প্রতিবেশী প্রকাশনী
জপমালা রাণীর গির্জা
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩। মোহাম্মদপুর শাখা
প্রতিবেশী প্রকাশনী
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ গেট এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৪। নাগরী
প্রতিবেশী প্রকাশনী
নাগরী শাখা
নাগরী পোষ্ট অফিস সংলগ্ন
পো: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ
গাজীপুর-১৪৬৩

আপনার বইটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞ/২৬১/২১

বিশেষ প্রতিবেদন

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক পালকীয় কর্মশালা ২০২১

প্রতিবেদনে : ফাদার বাবলু কোড়াইয়া ও অসীম ক্রুশ

দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবকের আহবান: "কৃতজ্ঞ হও" এ মূলসুরকে কেন্দ্র করে সেপ্টেম্বর ১২-১৩, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো পালকীয় কর্মশালা ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। উক্ত কর্মশালায় ফাদার সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তসহ ১৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ধর্মপ্রদেশেদের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং সঞ্চালনা করেন পরিচালনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য-সদস্যাগণ।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সেবাদলের আহবায়ক ফাদার বাবলু সি. কোড়াইয়া উপস্থিত সকলকে তার স্বাগত বক্তব্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আজ আমাদের রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বা জন্মদিন। এ দিনে আমরা ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কেননা তিনি আমাদের ধর্মপ্রদেশের শৈশব ও কৈশোরকাল পার করে ভরা যৌবনে উত্তীর্ণ করেছেন। তাই তো, এবারও আমরা, আমাদের ধর্মপ্রদেশের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে এ ধর্মপ্রদেশের বার্ষিক কর্মশালা করছি। আমরা যেন "কৃতজ্ঞ হই"- বিশপ মহোদয়ের এমন উদাত্ত আহবান, এ বছরের পালকীয় কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যা আমরা বাস্তবায়ন করছি। কর্মশালার মূলভাব নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে ধ্যান শুরু করেছি। এ কর্মশালায় শুধু আলোচনা নয়, আমরা যেন সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মপল্লীতে ফিরে গিয়ে সঠিক কাজটি করতে পারি।

বিশপ জের্ভাস রোজারিও তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, **এ বছর পালকীয় কর্মশালার মূলভাব "দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবকের আহ্বান: 'কৃতজ্ঞ হও'।** এ ব্যাপারে তিনি বলেন, "সৃষ্টির সকল কিছুই উপভোগ করার এবং ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির যত্ন করা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও আমরা পেয়েছি। এ সকল দায়িত্ব পালন করতে আমরা অনেক বার ব্যর্থ হয়েছি। কারণ ঈশ্বরের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ নই। আমরা কৃতজ্ঞ হলে ঈশ্বরের উপহারের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতাম। তাঁর সকল সৃষ্টিকে সম্মান, যত্ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করতাম।" আমাদের পিতামাতার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। কারণ আমাদের পিতা মাতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, ভালবাসা ও যত্নসহকারে আমাদের মানুষ করছেন। কিন্তু বর্তমানে কত বৃদ্ধ মা-বাবা ও পরিবারের প্রবীণ আত্মীয়-স্বজন অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে কষ্ট পাচ্ছে!

আমরা খ্রিস্টান হিসেবে, মণ্ডলীর কাছ থেকে অনেক সহায়তা পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য ও গড়ে ওঠার ব্যাপারে স্থানীয় মণ্ডলীর অনেক অবদান রয়েছে। মণ্ডলী আমাদের নতুন জীবন দিয়েছে আর সে আমাদের মায়ের মতই ভালবেসে ও যত্ন করে তার মূল্যবোধ ও নৈতিকতা দিয়ে গঠন দিতে নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হলো কৃতজ্ঞ হওয়া। আমাদের সন্তানদের মঙ্গলসমাচারের উপযুক্ত শিক্ষা ও নৈতিক গঠন দিয়ে কৃতজ্ঞ হওয়ার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে যেন তারা ঈশ্বর ও মণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শিখে। তাই, আসুন আমরা আমাদের সমাজে ও স্থানীয় মণ্ডলীতে "কৃতজ্ঞ হওয়ার" সংস্কৃতি গড়ে তুলি।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মিসেস সুলেখা গমেজ তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, কর্মশালায় অংশগ্রহণ ভাল ছিল, ধর্মপল্লীভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়গুলি ভাল ছিল। ভবিষ্যতে বিনোদনের ব্যবস্থা থাকলে আরও ভাল হবে। মি: আলেক্স মার্ডী বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্মশালায় সকলে অংশগ্রহণ করেছেন যা আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। মার্টিন মার্ডী বলেন, কর্মশালার নির্ধারিত বিষয় ও উপস্থাপনা ভাল ছিল।

কর্মশালা শেষ করার আগে সকলের নিকট প্রেরণ বিবৃতি উপস্থাপন করে পালকীয় সেবাদলের আহবায়ক ফাদার বাবলু সি. কোড়াইয়া বলেন, বিগত বছরের পালকীয় কর্মশালার মূলসুরের ধারাবাহিকতায় ও গৃহিত অগ্রাধিকারসমূহের আলোকে এই বছরের মূলসুর নেওয়া হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবকের আহ্বান: 'কৃতজ্ঞ হও'। এই কর্মশালার মধ্যদিয়ে আমরা পবিত্র বাইবেল ও কাথলিক মণ্ডলী ধর্ম শিক্ষার আলোকে এবং নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে কৃতজ্ঞ হওয়ার সংস্কৃতি চর্চার বিষয়ে অবগত হয়েছি। কর্মশালায় বিশপ মহোদয়ের পালকীয় পত্রের অনুধ্যান, ভিকারিয়া পর্যায়ে অনুষ্ঠিত তিনটি কর্মশালার সার-সংক্ষেপ প্রতিবেদন এবং ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে কর্মশালার দলীয় আলোচনার প্রতিবেদন উপস্থাপনার ভিত্তিতে আমাদের দর্শন, প্রেরণ এবং অগ্রাধিকারসমূহ নিম্নরূপ-

দর্শন (Vision): কৃতজ্ঞ অন্তরে সক্রিয় ও অংশগ্রহণকারী ভক্তজনগণ এবং স্বাবলম্বী স্থানীয় মণ্ডলী।

প্রেরণ (Mission)**:** ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলী পর্যায়ে প্রার্থনা, দান ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সমাজ ও মণ্ডলীতে সমন্বিত ও সম্মিলিত অংশগ্রহণ।

অগ্রাধিকারসমূহ (Priorities)

১. **অংশগ্রহণ :** পরিবারের সবাই মিলে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ, খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য প্রদান, নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীর বাড়িতে প্রার্থনায়, বাণী প্রচারে অংশগ্রহণ, সেবাকাজে (মণ্ডলি, সমাজের) অংশগ্রহণ।

২. **দান প্রদান :** মণ্ডলীর সেবাকাজে ও অভাবী ভাই-বোনদের সাহায্যার্থে শস্য, ফল-মূল, ফুল, খাদ্য, অর্থ, প্রতিভা, সময়, শিক্ষা, চিকিৎসা, বস্ত্র, গৃহ খাতে পরিকল্পিত ও নিয়মিত অনুদান প্রদান।

৩. **স্বেচ্ছাশ্রম :** কায়িক শ্রম, মণ্ডলী ও সমাজে সেবাকাজ, শিক্ষা বিস্তার, বাণী প্রচার, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছাশ্রম প্রদান।

৪. **নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার অনুশীলন :** নিজস্ব কৃষ্টি চর্চা এবং খ্রিস্টিয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলিতে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদের অনুশীলন এবং ভালবাসা, ক্ষমা, প্রশংসা, দয়া ও দান প্রদানের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার সংস্কৃতি চর্চা।

৫. **মানুষ, প্রকৃতি-পরিবেশ ও সৃষ্টির যত্ন :** পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন, বৃক্ষরোপন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, স্থায়িত্বশীল কৃষির চর্চা, স্থানীয় ও এলাকার জলবায়ু ও পরিবেশ উপযোগী ফসল, বৃক্ষ, মৎস্য, গবাদিপশু প্রতিপালন এবং মিতব্যয়িতা ও সম্প্রসারণে সঠিক পদক্ষেপ।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় ১৯তম কর্মশালার দায়িত্বশীল সেবক হিসেবে অন্তর-আত্মায় কৃতজ্ঞ হতে আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। কর্মশালায় গৃহিত অগ্রাধিকারসমূহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় মণ্ডলী ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করতে আমরা সবাই সমন্বিত ও সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করব। এই কাজে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ ও আশির্বাদ দান করুন।

সবশেষে বিশপ মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্য এবং পালকীয় কর্মশালায় এ বছরের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রার্থনা কার্ড থেকে সমবেতভাবে প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে॥

গামাসা আঞ্চলিক যুব সেমিনার

সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব কমিশনের আয়োজনে গত ১৭ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সাধু আগষ্টিন কোয়াজি ধর্মপল্লীতে কেওয়াচালা এবং ফাওকাল এর যুবক-যুবতীদের জন্য "বর্তমান বাস্তবতায় যুব জীবন এবং কর্মমুখী জীবন লক্ষ্য" মূলসুরের উপর ভিত্তি করে একটি গঠনমূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শুরুতে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার টমাস কোড়াইয়া সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন সেমিনারে যোগদানের জন্য। তিনি সবার সুন্দর ও স্বার্থক জীবন এবং সেমিনারের সফলতা কামনা করেন। এরপর সেমিনারের বক্তা জেমস সাইমন দাস তার সহভাগিতা তুলে ধরেন। তার সহভাগিতার মূল বিষয় ছিল যুব জীবনে উদ্বিগ্নতা এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ। তিনি বলেন, উদ্বিগ্নতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও আচরণগতভাবে। আর তা জীবনে নিয়ে আসে আশাহীনতা ও অশান্তভাব। বিষন্নতা জীবনে নিয়ে আসে হতাশা, কাজে আনে অমনোযোগিতা, নিজেকে মূল্যহীন ভাবা, নেতিবাচক চিন্তা করা, সিদ্ধান্ত না নিতে পারা। আর এ উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতার ফলাফল আত্মহত্যা ও নেশাদ্রব্য গ্রহণ করা। এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় হল ব্যক্তির আবেগিক অবস্থা সনাক্ত করে নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আবেগ যথাযথ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু কৌশল তুলে ধরেন।

এরপর নোয়েল গনছালভেস "ভবিষৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি শিক্ষা" এর উপর তার সহভাগিতা তুলে ধরেন। তিনি কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তুলে ধরেন। এ প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীদের কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে তোলে এবং আত্মকর্মসংস্থানের পথ সহজ করে দেয়। কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয় যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা নৈতিক, আধ্যাত্মিক, নিয়মানুবর্তিতা ও আচার আচরণগত বিষয়গুলো সম্পর্কে শিখতে পারে। এরপর যুব কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন গোছাল খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি তার সহভাগিতায় সঠিক বন্ধুত্ব ও আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গির উপর জোর দেন। দৃষ্টি ভাল হলে সৃষ্টি ভাল হয় আর দৃষ্টি খারাপ হলে সৃষ্টিও খারাপ হয়। তিনি সবাইকে সর্বদা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে আহ্বান করেন। খ্রিস্টযাগের পর যুবসমন্বয়কারী সবাইকে ধন্যবাদ দেন। একই সাথে উপস্থিত ফাদার ম্যাক্সয়েল টমাস ও ফাদার কাজল তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। সব শেষে পালপুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ দেন। এ সেমিনারে ৪ জন ফাদার, ৪ জন সিস্টার, ২ জন বক্তা, ২ জন এনিমেটর ও ১২৪ জন যুবক-যুবতীসহ মোট ১৩৬ জন অংশগ্রহণ করে। দুপুরের আহারের মাধ্যমে সেমিনার শেষ হয়॥

বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে পালকীয় কর্মশালা-২০২১

নিজস্ব সংবাদদাতা বিগত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার, যিশুর পবিত্র হৃদয়ের গির্জা বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে অর্ধদিনব্যাপী ধর্মপল্লীর পালকীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে মোট ১১৬ জন গ্রাম প্রধান, প্রার্থনা পরিচালক, মহিলা ও যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিলেন। ধর্মপল্লীর পালকীয় কর্মশালার মূলসুর ছিল **দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবকের আহ্বানঃ "কৃতজ্ঞ হও"**। শুরুতে ছোট প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করা হয় এবং সেইসঙ্গে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত, পুরুষ, মহিলা, যুবক ও যুবতীদের পক্ষ থেকে একজন করে প্রদীপ প্রজ্বলন করে। এরপর পাল-পুরোহিত ফাবিয়ান মারান্ডী সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রথম অধিবেশনে কৃতজ্ঞতা: ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান ও মাণ্ডলিক শিক্ষা উক্ত বিষয়ে উপস্থাপনা করেন ফাদার বাপ্পী এন ক্রুশ। তিনি তার উপস্থাপনায় বাইবেল ও মাণ্ডলিক দিক থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার উপর আলোকপাত করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে পাল-পুরোহিত ফাবিয়ান মারান্ডী ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনে কৃতজ্ঞ হওয়ার গঠন ও অনুশীলন-এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যেখানে তিনি সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দেবার প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। এরপর একটি প্রশ্নের আলোকে দলীয় আলোচনা করা হয় ও প্রতিবেদন পেশ করার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অতঃপর পাল-পুরোহিত সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে পালকীয় কর্মশালার পরিসমাপ্তি ঘটে॥

মহাদূত গাব্রিয়েল এর পর্ব উদ্‌যাপন ২০২১

বেনেডিক্ট মুর্মূ ▯ বেনিদুয়ার ধর্মপল্লীর সবচেয়ে পুরাতন (একশ বছরের ও পুরোনো) এবং প্রথম খ্রিস্টবিশ্বাসী গ্রাম বেগুনবাড়ী। বেনিদুয়ার ধর্মপল্লী হতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থান এই গ্রামটির। প্রায় তিন কিলোমিটার পাকা রাস্তা পাড়ি দিয়ে বাকিটুকু মাটির কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটা পথে বেগুনবাড়ী গ্রামে যেতে হয়। বেগুনবাড়ী গ্রামটি চারটি পাড়ায় বিভক্ত। খ্রিস্টবিশ্বাসী প্রায় এক হাজারের উপরে। এক সময় মিশন হতে সিস্টারগণ/ধর্মপ্রচারকগণ এই গ্রামে এসে থেকে খ্রিস্টবাণী প্রচারের কাজ করতেন। এখানে মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরী করা গির্জাঘরের (প্রার্থনা ঘর/চ্যাপেল) সাথে রুম বানানো যেখানে মফস্বলে আসার লোকজনের থাকার ব্যবস্থা ছিল। কালের পরিবর্তনে এখন আর এখানে এসে কাউকে থাকতে হয় না। এই এলাকার খ্রিস্ট বিশ্বাসী জনগণ গির্জার প্রতি পালক **"মহাদূত গাব্রিয়েল"**-পর্ব দিনটিকে উৎসব হিসেবে পালন করে এসেছেন। তবে এলাকার খ্রিস্ট বিশ্বাসী লোকজনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে বিগত ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রয়াত ফাদার পৌল ডি' রোজারিও (জয়গুরু) আড়ম্বরের সাথে পর্ব পালন এবং তীর্থস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২৯ সেপ্টেম্বর বেগুনবাড়ীকে **"মহাদূত গাব্রিয়েল"**-এর পর্ব তৃতীয় বারের মত উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই মহাপর্বদিনে এই তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা প্রয়াত নমস্য ফাদার পৌল ডি' রোজারিও (জয়গুরু)-এর প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়॥

নিজপাড়া ধর্মপল্লীতে ওয়াইসিএস মাসিক মিটিং এবং সাধু যোসেফের বর্ষ উদ্‌যাপন - ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার সুফলা মিঞ্জি সিআইসি ▯ বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৮টা থেকে নিজপাড়া ধর্মপল্লীতে যুবক-যুবতীদের আগমন ঘটে। করোনা পরিস্থিতির কারণে মাঝে বন্ধ থাকার প্রায় ৩ মাস পর আবারও মিটিং হওয়ায় তারা একত্রিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত। উল্লেখ্য যে, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের নিজপাড়া ধর্মপল্লীতে প্রতিমাসে ৩য় শুক্রবার ওয়াইসিএস প্রোগ্রাম করা হয়। আজকের এই প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারী ছিল ৯০ জন হাই স্কুল ও কলেজ ছাত্র-ছাত্রী। ওয়াইসিএস মিটিং-এ অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে সাধু যোসেফ এর বর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯:৩০মিনিটে সাধু যোসেফের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করা হয়। মূর্তি স্থাপনের পরে মালা পরানো হয় এবং খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন নিজপাড়া ওয়াইসিএস এর মডারেটর, ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার অভিদিও লাকড়া এবং তাকে সহযোগিতা করেন পাল-পুরোহিত ফাদার পিটার সরেন। খ্রিস্টযাগে ফাদার অভিদিও লাকড়া বাণী পাঠ ও মঙ্গলসমাচারের উপর আলোকপাত করে বলেন, বারোজন শিষ্যদের মত আমরাও মনোনীত বাণী ঘোষণা করার জন্য। আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট তাই আমরা সকলে কত সুন্দর। খ্রিস্টযাগের পর সকলে সাধু যোসেফের মূর্তি স্পর্শ করে বিশেষ আশীর্বাদ যাচ্না করে। খ্রিস্টযাগে শিশুমঙ্গল দলও অংশগ্রহণ করে।

এরপর ক্ষণিক বিরতির পর সনাতন দাস (দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ভুমি কমিশনের কর্মী) আদিবাসীদের জায়গা-জমি সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান, আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে এবং আইনী বিষয়ে ধারণা দেন। পরে সেল মিটিং এর জন্য ৬টি দলে ভাগ হয়ে যান যুবক-যুবতীরা। দুপুরের আহারের পর অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দলে বসে সেল মিটিং করে। নিজেদের দলে সহভাগিতা করে এবং সেবাকাজ বেছে নেয়। শেষান্তে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্ষুদ্র প্রার্থনার মাধ্যমে বিকাল ৪টায় দিনের কর্মসূচী শেষ করা হয়॥

গৌরনদী ধর্মপল্লীতে হলিক্রস ফ্যামিলী মিনিষ্ট্রি সেমিনার

সুমন হালদার ▯ গত ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে গৌরনদী ধর্মপল্লীতে ফরিদপুর, বানিয়ারচর, নারিকেলবাড়ী, ঘোড়ারপাড় এবং গৌরনদী থেকে আগত দম্পতিদের নিয়ে হলিক্রস ফ্যামিলী মিনিষ্ট্রি, বাংলাদেশ, এবং পরিবার কমিশন- এর ফ্যামিলী মিনিষ্ট্রি ডেস্ক এর আয়োজনে মোট ৭০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে 'পরিবার বিষয়ক সেমিনার' করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টায় সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার ডেভিড ঘরামী, সিস্টার বিনু পালমা, এলএইচসি, ফাদার রুবেন গোমেজ সিএসসি, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ এবং এসএমআরএ সিস্টারগণ। বিকাল ৪:৩০ মিনিটের অধিবেশনে "বিবাহ, পরিবার ও পারিবারিক আধ্যাত্মিকতা" বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার ডেভিড ঘরামী। তিনি অংশগ্রহণকারী দম্পতিদের পারিবারিক আধ্যাত্মিকতা, ক্ষমাদান, অনুমতি গ্রহণ, বিশ্বাসের আদান-প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ধন্যবাদ-প্রশংসা করার অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করতে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের গভীরে প্রবেশে সহায়তা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে "জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব" বিষয়ে সিস্টার বিনু পালমা এলএইচসি বলেন, 'জপমালা প্রার্থনা হল মঙ্গলসমাচারের সারসংক্ষেপ, মা-মারীয়ার সাথে তাঁর শিক্ষালয়ে বসে যিশুর জীবন নিয়ে ধ্যান করি, এ প্রার্থনা আমাদের বিশ্বাস হস্তান্তর করতে, মণ্ডলীতে আহ্বান বৃদ্ধিতে, সেবাপরায়ণ, সাধু-সাধ্বী,

পোপ, বিশপ, যাজক-সন্ন্যাসব্রতী আদর্শ, নেতা-নেত্রী হতে, শান্তি একতা-ন্যায্যতা স্থাপনে সহায়তা করে। সন্ধ্যায় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার সুবাস কস্তা সিএসসি এবং রাতে অংশগ্রহণকারীদের ধর্মীয় ভিডিও ক্লিপস দেখানো হয়।

দ্বিতীয় দিন ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে প্রথম অধিবেশনে সহভাগিতা করেন ফাদার রুবেন গোমেজ, সিএসসি। তার বিষয় ছিল 'যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একত্রে বাস করে'। এ বিষয়ে সহভাগিতায় বলেন, 'হৃদয়ে জীবন, পরিবারের শক্তি। আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের চাবি-কাঠি। প্রার্থনা এ জগতে স্বর্গরাজ্য রচনা করতে সহায়তা করে। জপমালা প্রার্থনা হলো পারিবারিক সেতুবন্ধন, পরিবারের আধ্যাত্মিক খাদ্য, আমাদের রক্ষাকবচ। এ প্রার্থনা আদর্শ পরিবার গড়ে তুলতে এবং পরিবারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সহায়তা করে, প্রার্থনারত বিশ্বাসই শান্তিময় বিশ্ব।' দ্বিতীয় অধিবেশনে 'সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে ভাইবোন সকলের অংশগ্রহণ' এই মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ে গোমেজ। পোপ মহোদয়ের 'লাউদাতো সি' অর্থাৎ 'হোক তোমার প্রশংসা' এ বিষয়ে ডাইওসিসের চিন্তা-ভাবনা এবং পোপ মহোদয়ের ভাবনা গুলো সহভাগিতা করেন। অভিন্ন বসতবাটির যত্নে সবাইকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। চুপ করে থাকা এবং ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সংস্কৃতি বাদ দিয়ে, যা হারিয়ে গেছে তা ধরে রাখতে হবে বলে তার সহভাগিতায় তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন এবং ধন্যবাদ দিয়ে দু' দিনের সেমিনার সমাপ্ত করা হয়॥

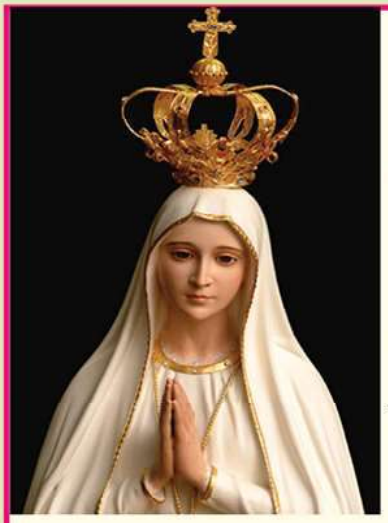

তীর্থ উৎসব!! তীর্থ উৎসব!! তীর্থ উৎসব!!!

বারমারী ফাতেমা রাণী মারীয়ার তীর্থ

মূলসুর: মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ গঠনে ফাতেমা রাণী মা মারীয়া।

স্থান: সাধু লিও'র কাথলিক গির্জা, বারমারী, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

তারিখ: ২৮, ২৯ অক্টোবর, রোজ: বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ, সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ এবং ভাইবোনেরা,

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আসছে ২৮-২৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, আমরা ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের সকল খ্রিস্টভক্তগণ ফাতেমা রাণী মারীয়ার তীর্থ স্থানে মহাসমারোহে তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। উক্ত তীর্থ উপলক্ষে বিশপ মহোদয় সকলকে আহ্বান জানান "দেশ ও বিশ্বের শান্তি, একতা, মিলন, বিশ্ব ভ্রাতৃসমাজ গঠন, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের সমস্ত খ্রিস্টভক্তদের কল্যাণ ও পাপী মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য এসো আমরা সবাই ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করি। দয়াময়ী মায়ের সাথে আমাদের তীর্থযাত্রায় আমরা ত্যাগস্বীকার; প্রায়শ্চিত্ত, মন পরিবর্তন, পাপস্বীকার ও প্রার্থনার মাধ্যমে বিশেষ পুণ্য অর্জন লাভ করতে পারবো।" তীর্থ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আপনারা সকলে আমন্ত্রিত। তীর্থের বিশেষ প্রস্তুতির চিহ্নস্বরূপ ১৯ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত নভেনা প্রার্থনা চলবে।

❋ পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান : ৫০০/- টাকা মাত্র ❋ খ্রিস্টযাগের বিশেষ দান : ১৫০/- টাকা মাত্র।

অন্যান্য যে কোন দান বা মানত সাদরে গ্রহণ করা হবে।

তীর্থের অনুষ্ঠান সূচি

২৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার

বিকাল ৩:০০ মি: পুনর্মিলন/পাপস্বীকার
বিকাল ৪:০০ মি: পবিত্র খ্রিস্টযাগ
রাত ৮:০০ মি: আলোক শোভাযাত্রা
রাত ১১:০০ মি: আরাধ্য সাক্রামেন্তের আরাধনা, নিরাময় অনুষ্ঠান
রাত ১২:০০ মি: নিশি জাগরণ

২৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

সকাল ৮:০০ মি: জীবন্ত ক্রুশের পথ
সকাল ১০:০০ মি: মহাখ্রিস্টযাগ

আহ্বায়ক
ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থ উদ্‌যাপন কমিটি
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ।

বি. দ্রঃ তীর্থ বিষয়ক যেকোন প্রয়োজনে তীর্থ কমিটির সমন্বয়কারী রেভা. ফাদার তরুণ বনোয়ারী এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়াও বছরে যেকোন দিন যদি কোন ব্যক্তি, পরিবার, দল বা সংঘ সমিতি তীর্থ করতে আসতে ইচ্ছুক তাদের সাদরে আহ্বান জানাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।
মোবাইল : ০১৭৪১০২৪৮১৮, ০১৯১৬৪২৪৪৩৮।

বিজ্ঞ/২৬২/২০২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৩৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 36
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা-৩৬
Regd. No. DA-33
❖ 3 - 9 October, 2021, ১৮-২৪ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

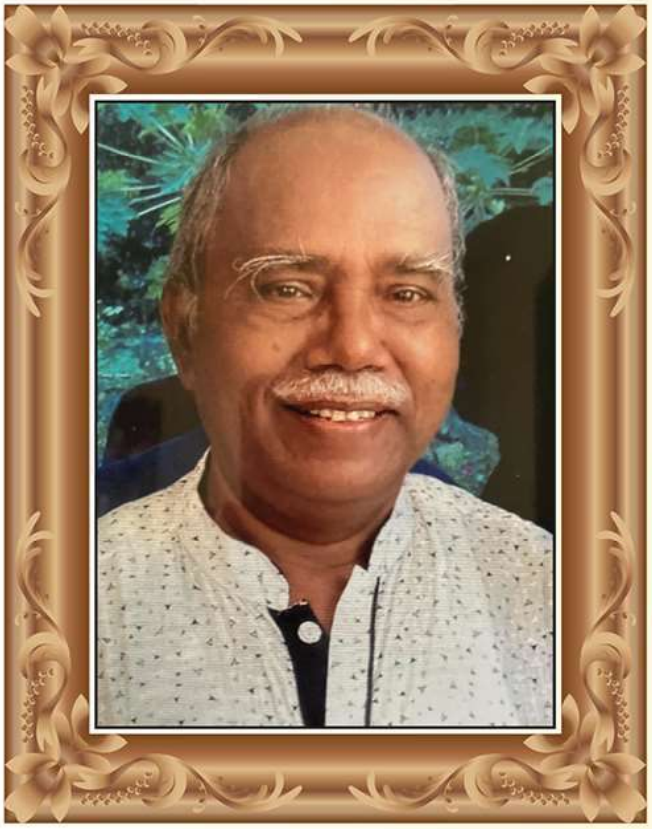

চির বিদায়ের ১ম বার্ষিকী

বাবা / দাদু
আমরা তোমায়
অনেক অনেক ভালবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ছোট সাতানীপাড়া
মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)
গ্রাম: কুচিলাবাড়ি
মঠবাড়ি মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

দেখতে-দেখতে ১ বছর চলে গেল, ফিরে এলো ৬ অক্টোবর। এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে- সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি– আর কোনদিন তোমায় দেখতেও পাবো না, এই নশ্বর পৃথিবীতে। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে– আর তোমার কল বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" আবার বাড়ি ফিরলে তোমার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো– সব কালিমা দূর হয়ে যেতো। এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই- কষ্টের কথা। "কেমন আছো" - জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" শৈশবে মাকে হারিয়ে তুমি বেড়ে উঠেছিলে সীমাহীন অনাদরে– মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি- ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায়- তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারিমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারিমালা প্রার্থনা করতে- নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগ শুনতে।

তুমি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়– মনে হয় তুমি হয়তো দূরে কোথাও বেড়াতে গেছো – আবার ফিরে আসবে আমাদের মাঝে। কিন্তু না– তুমি সুদূর আকাশের কোনও এক মায়াবী নক্ষত্র হয়ে চলে গেছো– যেখান থেকে আর কখনও ফিরে আসা যায় না।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদুকে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য -
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি-নাতনিরা -
এশী, যাকোব, অর্থী, অন্তী, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অথৈ, অবনী, রাহেল, মার্সিয়া ও স্যাম।

বিজ্ঞ/২৫৭/২০২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org